শিশু-মনের চলচ্চিত্র

উপন্যাস

শ্রীমতিলাল দাশ।

এক টাকা

শিব-সাহিত্য-কুটীর
২৬।৮এ, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার
শিবসাহিত্য কুটীর,
২৬।৮এ হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

পরিচিতি।

প্রথম পাঁচ পরিচ্ছদ ১৩৩৬ সালে লেখা এবং বিচিত্রায় প্রকাশিত, শেষ পাঁচ পরিচ্ছদ ১৩৪২ সালে লেখা এবং দীপিকায় প্রকাশিত।

কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে
প্রাপ্তব্য।

শ্রীনির্ম্মলকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
স্তাভোনিয়া প্রেস হইতে মুদ্রিত।
৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

স্বর্গত

শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী দাশের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

ঠাকুরমা !

পিতৃপক্ষে [illegible] শ্রদ্ধার

তর্পণ গ্রহণ করো।

কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথি,
চুঁচুড়া, ২৩শে আশ্বিন
১৩৪৬

তোমারই

মতিলাল।

শিশু-মনের চলচ্চিত্র

১

মামাবাড়ী !—

কথা শুনিতেই মন যেন অকারণে খুসি হইয়া ওঠে। মামাবাড়ী-নামের মধুরতা অব্যক্ত। মরমীর দরদ দিয়া অনুভব করিতে হয়।

বর্ত্তমান বয়সের ভাষায় বলিতে পারি— যেন উষার প্রথম আশিসের মত স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন, যেন বাদলদিনের কাজলরাতের মত চিরবাঞ্ছিত, প্রিয়ার প্রেমোচ্ছ্বসিত উষ্ণস্পর্শের মত অপূর্ব্ব ও অনুপম।

কাছে নয়,—দূরে।

পাশে যাহা থাকে, তাহার সুষমা মনকে ভুলায় না। অজানার মাঝে যেন কোনও মধু লুকাইয়া থাকে, রূপকথায় তাই অচিন-দেশের রাজপুত্র চাই!

শ্যামা বাংলার কলনাদিনী নদী।—

কত যে তার ভঙ্গী, কত যে তার রঙ্গ! বাঁকে বাঁকে তার নূতন রূপ, বীচিকল্লোলে তার পলে পলে নূতন সুর। যতই চলি. ততই যেন স্বর্গ-পুরীর যাদু মেলে।

ধানের ক্ষেত, গমের ক্ষেত, খামার-বাড়ী, নদীর ঘাট, পথিক-চলা বাট, ধু ধু উদাস মাঠ, নৌকার পাল, জেলের ডিঙ্গি, মাছধরা জাল, হাঁড়িভরা কুমারের হাটুরিয়া নৌকা, শিশু-মনে কত কৌতুহল জাগাইয়া তোলে। মায়ের কোলে ঘুম আসে না।—প্রশ্নে প্রশ্নে জ্বালাতন হইয়া ওঠেন মা।

মামা বাড়ীতে দুই-নৌকা লোক চলিয়াছি। ঘোমটা-পরা মামীরা ঘোমটা খুলিয়া পৃথিবীর মুক্ত রূপ দেখিতেছেন। পিছনে মায়ের ঘরের আদর, সম্মুখে অনিশ্চিত শঙ্কা।

ছোট মামীর মন তাঁর ছোট ভায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। আমায় আদর করিয়া ডাকিলেন, "খোকা আমার কোলে এস।" আমি তখন ৬।৭ বৎসর বয়সের মালিক। খোকা অপবাদ গায়ে তুলিতে চাই না। তাই মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলাম, "আমি খোকা নই, আমি অজিত।"

মায়ের মুখে হাসির প্রসন্ন আভা ঝলকিয়া গেল। মেয়েরা সব হাসিয়া কুটি-কুটি হইল।

সন্ধ্যা নামে।

মাঠে মাঠে ধানের শীষে, গোধূলির রক্ত আলোর দোল বহিয়া যায়। আকাশ-পথে বকেরা ঘরে ফিরিয়া চলে। নদীর নিস্তরঙ্গ জলে বকদের সেই উড়ন্ত রূপ নাচিতে থাকে। দূরে গ্রামের মন্দিরে সন্ধ্যারতির বাজনা বাজে, তরুবীথির ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে।

ছোট মামা পায়ে পট্টি বাঁধিয়া মালকোঁচা মারিয়া বন্দুক হাতে ছইয়ের উপর বসেন। পথে সব ডাকাতের ভয়—গা ছম-ছম করিয়া ওঠে! বন্দরে নৌকা ভেড়ে; তীরে রাত্রির রান্না চলে।

আজিমার কোলে মাথা দিয়া গল্প শুনি।

আজিমার শান্ত মধুর রূপ আমার জীবনে ভুলিব না। করুণা-প্রশান্ত, হাস্যবিভাত তাঁর সঙ্গ যেন এক আনন্দের লোকে লইয়া চলে। কতদিন কত যে কথা, কত যে কাহিনী, কত যে পুরাণ, কত যে গান

তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, আজিও হয়ত মগ্নচৈতন্যে তাহারা লুকাইয়া রহিয়াছে।

রূপকথা বাঙ্গালীর ছেলেরা এখনও শুনিতে পায় কিনা জানি না। বর্ত্তমানের বধূ ও গৃহিণীরা নভেল পড়িয়া কাল কাটান। দেশের যে প্রাচীন ভাবধারা, মুখে মুখে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত নবীনাদের যোগ নাই।

যৌবনের তটপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কতবার ভাবি—যদি আবার রূপ-কথার শৈশবে ফিরিতে পারিতাম।

পক্ষীরাজ ঘোড়া!

তেপান্তর মাঠ ছাড়াইয়া, মরু-কান্তার ভেদিয়া, কত অচিন দেশে সে ছুটিয়া চলে। মনের পটে কত আধ-জাগা ছায়া জাগে।

রাজপুত্তুর ঘুঁটেকুড়ানি মায়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য, মাণিকদহে মাণিক আনিতে চলিয়াছে। কত বিঘ্ন, কত বাধা। রাক্ষস ও দৈত্যের দেশ হইতে "কুঁচবরণ কন্যা যার মেঘবরণ চুল" তাকে নিয়া ফিরিয়াছেন। মনের পরে এই রূপকথা সুদূরের কি পিপাসা জাগাইয়া তুলিত! রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতাম।

আমিও যেন চলিয়াছি। বিজয়ী বীরের মত সাগর-নদী পার হইয়া, গহনবন ছাড়াইয়া…

তারপর হিজিবিজি হইয়া যায়।

কোনও দিন বা হীরার পালঙ্কে নিদ্রিত, সোনার-প্রতিমা রাজকন্যা চোখে ভাসিত। বীভৎস-দর্শন রাক্ষসেরা ছুটিয়া আসে—ভয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

চোখ মেলিয়া দেখি, পূবের আকাশে কে সিঁদূর লেপিয়াছে। শেষরাতে মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়াছে—বন্দর ফেলিয়া, বড় নদী ছাড়িয়া খালে পড়িয়াছি ; জলো দেশ।

খালের পর খাল চলিয়াছে, ওড়া গাছের ফল ভাসিয়া চলিয়াছে।

শীতলপাটির ঘাসে কূল ভরিয়াছে। যত চাই, তত যেন কি এক যাদু নয়নে লাগিয়া যায়।

প্রকৃতির আবেদনের চেয়ে পেটের আবেদন বেশী।

মায়েরা সব সম্মুখে ঝুঁকিয়া মামাবাড়ী কতদূর তাহার হিসাব কষেন। নন্দীগাঁয়ের বটতলা ছাড়ালেই কুশদ্বীপ।

কুশদ্বীপের শিবমন্দিরের চূড়া ঐ যে দূর হইতে দেখা যায়,—তারপরই মামাবাড়ী।

নৌকার পাটাতনের তলে হরেকরকমের খাবার। স্যাজা মামা, বাদুড় ও আমি যুক্তি করি, পাটাতন তুলিয়া দুধের ক্ষীর, ছাঁচ, নারিকেলের নেওয়া-আতা, জিরে-লাড়ু গাল ভরিয়া তুলিয়া লই।

আজিমার দৃষ্টি পড়ে। পাটাতন বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু যতটুকু পাই, তাহাই যথেষ্ট, স্যাজা মামা বয়সে বড় ; নাদুস্ নুদুস চেহারা। মামা বলে, "জানিস, আমি কচু খেতে পারি,—তাই না লোকে স্যাজা ব'লে ডাকে।"

অবাক হইয়া থাকি। সজারুর সহিত মামার জ্ঞাতিত্ববন্ধনের ইতিহাস কৌতুকপ্রদ। "তুই ভাবছিস্ মিথ্যে, চ' একদিন কচু খেয়েই তোকে পরখ দেখাব।" বাদুড় মাসতুতো ভাই,—বয়সে বড়। দাদার হটিবার সখ নাই। দাদা বলে, "চুপ কর স্যাজা, তোর ন্যাকামি করতে

হবে না। শোন অজু, মামাবাড়ী অমৃত-ফল আছে, আমি তোকে অনেকগুলি এনে খাওয়াব, বুঝলি? কিন্তু তোর ঐ লাল লাটিমটা আমায় দিতে হবে।"

আমায় আর পায় কে! কাঁকামণি দম-দেওয়া লাটিমটি দাম দিয়া কিনিয়া দিয়াছিলেন। মামাবাড়ীর সবাইকে দেখাইয়া চমক লাগাইব মনে ছিল। তাই শয়নেও বালিসের তলায় আমার সাতরাজার-ধন-মাণিককে লুকাইয়া রাখিতাম।

কিন্তু অমৃত-ফল? অজানার এক মোহ আছে। সে আমায় ভুলাইল। বালিসের তলা হইতে সন্তর্পণে আনিয়া বাদুড়-দাদার হাতে দিলাম। পরক্ষণেই ফেরত লইলাম।

মনের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব। ধ্রুবকে ছাড়িয়া অধ্রুবগ্রহণের জন্য নয়, যাহাকে প্রিয় করিয়াছি, তাহাকে বিদায় দিতে ব্যথা লাগে! যে পরম আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে যে আত্মায় ছাড়িতে চায় না।

স্যাজা মামা বলে, "অজু, দিসনে।"

ভাবাইয়া তুলে, কি করি ঠাহর করিতে পারি না। বাদুড় বলে, "না দিস্ চাইনে, অমন লাটিম কত পাব!"

মিথ্যা দম্ভ, অহেতুক আস্ফালন।

কিন্তু তখনকার বয়সে বুঝিবার সাধ্য ছিল না। অস্থিরমতি হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা যখন চাইবো, তখন দেবে ত?"

বাদুড় তখনই স্বীকৃত হইল। কিন্তু বয়সের চেয়ে বুদ্ধি তাহার বেশী, তাই সে বলিল, "কিন্তু লাটিম আমার হ'ল, বুঝলে ত?"

স্বামিত্বের জ্ঞান তখন পূরামাত্রায় জাগিয়াছিল কিনা বলা কঠিন। স্বত্বত্যাগের মধ্যে যে চিন্তা ও বোধ চাই, তাহা হয়ত তখন জন্মে নাই। জন্মিলে হয়ত চুক্তি করিতাম, কারণ তাহা হইলে পরে চুক্তিভঙ্গের নালিশের কারণ থাকিত, আর উকিল, মোক্তার, মুহুরীর পয়সার সংস্থান হইত।

তাই ব্যাপার না বুঝিয়াই বলিলাম, "আচ্ছা।"

পরক্ষণেই বলিলাম, "কতগুলি অমৃত ফল দেবে?"

বুদ্ধিমান বাদুড়-দাদা উকিল হইবার জন্য হয়ত জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বকাটে হইয়া যুদ্ধের পাড়ি জমাইয়া এখন সুস্থশরীরে আইন-রক্ষার কাজ করিতেছেন। মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "যে ক'টা পাব, তোকেই দেব; এ যে-সে লোক নয়—মরদ্‌কা বাত হাতীকা দাঁত!"

উপমার বাহাদুরি তখন বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি একটি প্রবল আশ্বাসে লাটিমটি বাদুড়-দাদাকে দিলাম।

কুশদ্বীপ ছাড়াইয়া, মামাদের মনসাতলার ঘাট ছাড়াইয়া। হাট পার হইয়া মঠের পাশে নৌকা ভিড়িল।

মামাবাড়ীর লোক তীরে দাঁড়াইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতেছিল। নৌকা থামিতেই লাফাইয়া আজা-মহাশয়ের স্কন্ধে চাপিলাম। স্নেহার্দ্র স্বরে তিনি বলিলেন "দূর শালা!"

স্নেহমধুর এই গালাগালি আমার দৌরাত্ম্য থামাইতে পারিল না! মা বাহির হইয়া আসিয়া আজা-মহাশয়ের পায়ে প্রণাম করিলেন।

আমাকে বলিলেন, "অজু, বাপধন! নেমে এস, ছি—আজা-মহাশয়ের গায়ে পা দিতে নেই।"

নীতিশাস্ত্র মনে ধরে না, কিন্তু কেমন করিয়া জানি না, প্রীতির স্পর্শ অনুভূতিকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।

মায়ের আদেশ আর প্রীতির অদৃশ্য আকর্ষণ আমায় দ্বিধান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু আজা-মহাশয় মায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "থাক্, থাক্ ছেলেমানুষ!" ছেলে মানুষ!...

দুরন্ত অভিমান বুকে জাগিয়া ওঠে। আজা-মহাশয়ের সাদা চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলি, "আমি ত আর ছেলে মানুষ নই?"

জীবনের প্রান্তদ্বারে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ কৌতুক অনুভব করেন। হাস্যোচ্ছ্বসিত কৌতুকে বলেন, "ভুল হ'য়েছে দাদা, তুই কি ছেলেমানুষ?—তুই যে আদ্যিকালের বুড়ো!" খুসী হইব কিনা বুঝি না। ছোটবয়সে বড় হইবার জন্য বৃহৎ পিপাসা থাকে। অনুভূতির সমস্ত পথ শিশুর জন্য খোলা নহে। তাই শিশু ব্যাকুলতায় নব নব অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের আশায় ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

"আদ্যিকালের বুড়ো!"

কল্পনার লাগাম ছুটাইতে হয়। রূপকথায় মনের যে ভাসা-ভাসা প্রসার হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি। কোন্ অনাদি যুগের যাত্রার স্মৃতি যেন চকিত করিয়া তোলে। কিন্তু সকলই অস্পষ্ট,—সকলই আবছায়া।

বিপত্নীক আজা-মহাশয়। তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে আমিই প্রথম বংশধর। তাই অফুরন্ত আদরে দিন কাটিয়া যায়। বুড়ার সহিত শয়ন,

ভ্রমণ ও লীলা-কৌতুক। আমায় বুকে করিয়া বুড়া হয়ত হারানো স্মৃতির জন্য উতলা হইয়া ওঠেন।···মামাবাড়ীতে বিবাহ সন্নিকট হইল।

লোকজনের সমারোহে চারিদিক সরগরম হইল। কাজেই বুড়ার সঙ্গ ছাড়িয়া সমবয়সীদের সঙ্গ লইতে হইল।

মা বড়-মেয়ে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, তাঁর বাপের বাড়ীতেও কাজের সীমা নাই। তাই মায়ের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া বাহির হইয়া পড়ি।

আজা-মহাশয় একটা চক্‌চকে টাকা ও একটি পয়সা দিয়াছিলেন। টাকাটি খরচ করিতে প্রাণ সরে না। সেটি পুতুলের বাক্সে জমাইয়া রাখিলাম।

পয়সাটি হাতে হাতে ফেরে।

সে যুগ হরেকরকমের কোট-প্যাণ্টের যুগ নয়। নীলাম্বরী ধুতি পরিয়া, আলো ও বাতাসের স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতাম। বিনামা নাই, সিল্কের ফেজ নাই, সার্ট নাই, তাহার জন্য ব্যথা ছিল না। প্রকৃতির নগ্ন শিশুর মত প্রকৃতির কোলেই ঘুরিতাম!

কোচার খুঁটে পয়সা দেখিয়া স্যাজা মামা বলিল, "চল্ হাটে বিলাতী মিঠাই কিনে খাওয়া যাক্?"

আপত্তির কিছুই ছিল না। হাট দেখিবার জন্যও মন ব্যস্ত ছিল। মামাবাড়ীর দরদালানের সম্মুখ দিয়া সড়ক—বড় পুকুর পার হইয়া, বটতলা ছাড়াইয়া, মাঠের মাঝ দিয়া হাটে পড়িয়াছে।

কর্ত্তারা হয়ত যাইবার অনুমতি দিবেন না। বাদুড় বলিল, "চল, খিড়কী দিয়ে যাই।"

বাড়ী পার হইয়া নালার পাশে অনেক বুনো-কচুর গাছ। ভাবানুসঙ্গ মনে নৌকার কথা জাগাইয়া তুলিল। বলিলাম, "কই মামা, কচু খাও ?"

স্থাজা মামা অম্লানবদনে বলিল, "খাচ্ছি, তাহ'লে কিন্তু আমায় তুটো বেশী মিঠাই দিতে হবে।"

কৌতুকের এ দাম দিতে অস্বীকার করা চলে না।

স্থাজা মামা কচ্ কচ্ করিয়া বুনো-কচুর ডগা চিবাইয়া তাহার সজারু নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া তুলিল।

পাড়াগাঁয়ের হাট। আয়োজন অপ্রতুল। তু' চারখানি খালি চালা রহিয়াছে। হাটের দিনে পসারী বসে। বাঁধাঘর তু' তিনখানি আছে। এক পয়সায় দোকানী আটটি বিলাতী মিঠাই দিতেছিল। বাতুড় বলিল, "আর একটি দিয়ে দেও হে!"

দোকানী অপ্রসন্ন হইল, কিন্তু আর একটি দিয়া পুঁটুলি বাঁধিতে বসিল। আমার মনে ভাগ-সমস্যা প্রকাশ হইয়া দেখা দিল। আমি দোকানীর মুখের দিকে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, "আর একটি দাও না?"

দোকানী আমার স্নিগ্ধ-ব্যাকুলস্বরে চকিত হইয়া চাহিল। তাহার পর বিনা দ্বিধায় দশটি বিলাতী মিঠাই দিল।

সহজে যাহা পাওয়া যায়, মানুষের মন তাহাতে ভোলে না। মানুষ ফাউ চায়, ফাউকে সে বাহাতুরি ও লাভ বলিয়া মনে করে। কিন্তু আমার আবেদনের মধ্যে এ ভাব ছিল না।

স্থাজা মামাকে অনিচ্ছায় চারিটি মিঠাই দিতে হইল। আমার পয়সা; আমি চারিটি নিলাম—বাতুড় তুটি পাইল।

বাদুড় ইহাতে তৃপ্ত নহে। আকাশে ওড়া যাহার অভ্যাস, অ লইয়া তাহার চলে না। আমার মন ভুলাইবার জন্য বলিল "বুঝেছিস্ অজু, কালই অমৃত-ফল আনতে যাব। "কি বলিস্ যাবিনা?" কি করি, লাটিম গিয়াছে, বিলাতী মিঠাইও একটি বেশী দিতে হইল। পরের দিন অমৃত-ফল আনিতে যাওয়া হইল না। সমবয়সী মাসী বলিল, "আঁচাখুঁচি" খেলিতে হইবে। মামাদের বাড়ীর লম্বা উঠানের শেষে আমগাছের ছায়ায় বনপিপুল গাছ ভরিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে রান্নাবান্না খেলা চলিল। মাসী রাঁধুনি। আমরা নারিকেলের পুষ্প কুড়াইয়া চাল আনিলাম, বনহেলাঞ্চের ফল কুড়াইয়া ডাল করিলাম, নালা হইতে চুণাপুঁটি ধরিয়া মাছ করিলাম। কলাপাত আনিয়া পাতা করিলাম। এমনই করিয়া খেলা চলিতেছিল!—ব্যাং-মামা আসিয়া অনর্থ করিল।

রাজকুমার রাজার ঘরে না জন্মিয়া কুমারের ঘরে জন্মিয়াছিল; মন ছিল তার উদার ও প্রশস্ত। ছোট-বয়সে মাকে সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। মা তাহাকে কাকা বলিয়া ডাকেন, আর কাকার মত সমাদর করেন।

রাজকুমার-দাদা, মামাবাড়ী পৌছিতেই একটা সুন্দর পুতুল আনিয়া দিয়াছিল। পুতুলটি একটি মেয়ের মূর্ত্তি—রং ফলাইয়া তাহাকে রাজকুমার জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

আজিমা'রা ঠাট্টা করিয়া বলেন, "ওটি কি তোর বউ?'

আমি মুখ রাগ করিয়া বলি, "যাও, মেরে ফেলবো বল্‌ছি।"

কিন্তু মনে যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দ জাগে। নিজের বউ—কল্পনায় যেন এক সুখস্রোত অঙ্গে খেলিয়া যায়।

সেই মনোহরণ বউ আমতলায় আনিয়া সাজানো হইয়াছিল। ব্যাং-মামা দৌড়াইতে বউ দুইখণ্ড হইয়া ভূমিতে লুটাইল। রাগে ও দুঃখে আমার কান্না পাইল। ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম, —"আমার বউ, আমার বউ!···"

বড়-মামী কি কাজে পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। কারণ শুনিয়া হাসিলেন, পরে সান্ত্বনা দিতে বলিলেন, "কাঁদিস নে অজু, রাজকুমার আবার একটা পুতুল দিয়ে যাবে'খন।"

কান্না থামে না। বিয়োগ-দুঃখ অত সহজে নিঃশেষ হয় না। দর্শন এখানে মূক হইয়া যায়; যুক্তি এখানে হৃদয়স্পর্শ করে না। ছোট-মামা হল্লা শুনিয়া আসিয়া, বিচারকের গম্ভীর চালে ব্যাং-মামাকে উত্তম-মধ্যম দিয়া আপন শক্তির পরিচয় দিলেন।

প্রতিহিংসা বোধ হয় মানুষের আদিম সহজ-প্রবৃত্তি। ব্যাং-মামা মার খাইতেই অনেকটা উল্লাস হইল।

মাসী প্রায় সমবয়সী। কিন্তু মেয়েরা অল্প-বয়সেই অনেক জানে। আমায় চুপি চুপি বলিল, "কাঁদিস্ নে অজু, বাবাকে বলে তোর একটা রাঙা বউ এনে দেবো।"

রাঙা বউ রঙীন স্বপ্নধারা লইয়া মনের মহলে-মহলে হানা দেয়। ব্যাপার হয়ত এখানেই শেষ হইত। কিন্তু ব্যাং-মামা রাগে গরগর করিতেছিল। ছোটমামা পলাতেই ছুটিয়া আসিয়া আমার পিঠে

বা-কয়েক দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ছোট বয়সের মারণাস্ত্র—কান্না।

নানা সুরে কান্না চলিল। মাসীর প্রবোধে চিত্ত শান্ত হয় না। মেজ আজিমা যাইতেছিলেন। আদর করিয়া কোলে লইয়া বলিলেন, "বউয়ের জন্য কাঁদছিস? ছি!—আমায় বিয়ে করবি?"

এ সব রস-কৌতুক তখনকার দিনে চলিত। বর্ত্তমানের সভ্যতার মাপকাটিতে মাপিলে ইহা অশ্লীল বলিয়া মনে হইবে কিনা জানি না।

ভাবনায় পড়িলাম। আশা যত দূরে থাকে, ততই মধুর থাকে। কোনও ভাবনা থাকে না। প্রৌঢ়া আজিমাকে বউ করিবার মধ্যে কৌতুক-রস হয়ত ছিল, কিন্তু তাহা কৌতুক বলিয়া অনুভব করিবার বয়স ছিল না।

নিরুত্তর হইয়া আজিমার বুকে মুখ লুকাইলাম। আজিমা হাসিয়া বলিলেন, "কিরে অজু, আমায় পছন্দ হয় না? দেখ্ না, কেমন কাঁচা সোনার রঙ, বড় বড় কি চুল······"

ছেলেরা হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হওয়ার চেয়ে আমিও হাসিতে যোগ দিলাম। পরের দিন সকালে ফেনভাত খাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মামাদের গোয়াল-ভরা একপাল গরু ছিল। রাখালের সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

ধানের মাঠ মাইলের পর মাইল চলিয়া গিয়াছে। দূর-দিগন্তে চক্রবাল শ্যামা ধরণীর অনুরাগে নত হইয়া পড়িয়াছে। বিলান-দেশ, খালে বিলে ভরা।

খালের ধার দিয়া চলিলাম। অমৃত-ফল ফলিবার সময় নয়; লতানো গাছ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ফল মিলে না। চলিতে চলিতে অজানা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়ি।

ছোট বয়স হইতে সাপের ভয় বেশী। মানবের মনে সাপের ভয় বোধহয় আদিম যুগ হইতে বংশানুক্রমে অনুক্রমিত হইয়াছে। জলা জায়গায় আর্দ্র মাটিতে পা পড়িতেই শিহরিয়া উঠি। তথাপি "অমৃত-ফল" পাওয়ার আশা নেশার মত চাপিয়া ধরে। খুঁজিতে খুঁজিতে একটি লতায় চারিটি ফল মিলিল।—ছোঁ মারিয়া একটি ফল লইলাম।

সবুজবরণ কোষের তলে দেশী বাদামের শাঁসের মত সাদা দুইটি কি তিনটি শাঁস। খাইতে ঈষৎ মিষ্ট। বর্ত্তমানের কেক-খাওয়া শিশুরা হয়ত তাহাকে জংলা ফল বলিয়া দূর করিবে, কিন্তু শৈশবের কল্পনামাখা অমৃত-ফল খাইয়া কি যে অনির্ব্বচনীয় অমৃত পাইয়াছিলাম, আজ তাহা শুধু গভীরভাবে অনুভব করিবার বিষয়, বর্ণনার নহে।

বাকি তিনটি তিন জনে লইয়া বিজয়ী বীরের মত গৃহে ফিরিতেছিলাম।···ধানের চেহারা দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

এতক্ষণ মন ব্যস্ত ছিল, তাই নিসর্গ-মাধুরী দেখি নাই। এবার দেখিলাম, বিতত শ্যামলিমা। মাঝে মাঝে রূপালি জলরেখা চলিয়া গিয়াছে। পাখীর মেলা বসিয়াছে। কত যে রঙ-বেরঙের পাখী—নাম শিখি নাই। কিন্তু তাদের কলকূজন মনের মাঝে যে রেখাপাত করিয়াছিল, অর্দ্ধজাগ্রত চৈতন্য হইতে তাহা এখনও যেন কানে ভাসিয়া আসে।

পথে একটি মাঠের পাশে নালায় 'চারো' পাতিয়া চাষীরা মাছ ধরিবে বলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। বাদুড়-দাদার দুষ্টামি জাগিয়া উঠিল, বলিল, "মাছ ধরিতে হইবে।"

আমার বাধ-বাধ লাগিতেছিল। কিন্তু দুরন্তপনার প্রতি মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক টান আছে। তাই মাতিয়া উঠিলাম।

বাদুড় ও স্যাজা অমৃতফল দুটি ডাঙ্গায় রাখিয়া জলে নামিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করিল। আমি ডাঙ্গায় রহিলাম।

ধানের ক্ষেতের আলির উপর দিয়া পথিক চলে, তিনজন লোক একজনের হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, আমাদের দুষ্টামি বুঝিতে পারিয়া তাহারা চেঁচাইয়া বলিল, "ক'রা রে?" খাঁড়া হাতে বীর খাঁড়া দোলাইল। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল! অপরিচিত মানুষের হাতে প্রাণ-ঘাতী অস্ত্র, আর অন্যায়কারী অসহায় আমরা। বাদুড় ও স্যাজা জল হইতে লাফাইয়া ছুটিল। আজও ছুট—কালও ছুট।

বড় হইয়া পড়িয়াছি :—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি।"

বই পড়িয়া একথা শিখিবার প্রয়োজন নাই, কারণ এটা পশু-ধর্ম্ম, মানুষের সমস্ত সৃষ্টির মাঝে এটা এখনও সদা-জাগ্রত চক্ষু মেলিয়া রহিয়াছে।

বাদুড় ও স্যাজা পলাইল! অসহায় সঙ্গীর কথা ভাবিবার সময় নাই। নিরুপায় আমিও পিছনে ছুটিলাম।

কিন্তু সবল উহারা, আমার আগে কোথায় মিলাইয়া গেল কে জানে! —"দে ছুট্ দে ছুট্!"

কাঁটাবন ঝাঁপাইয়া খাল ডিঙ্গাইয়া চলিলাম। কিন্তু অশিক্ষিত পা চলে না। নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

সম্মুখে চাহিয়া দেখি কেহ নাই, পিছনে কেহ নাই। ধূ-ধূ মাঠ আর বিরাট নির্জ্জনতা।

ধানের শীষ বাতাসে দুলিয়া যায়,—তরুশাখে পাখীরা গান গায়। খালের জল উল্লাসে ধায়।

চারিদিকে বৃহৎ পৃথিবী। পুষ্পেপত্রে তরুলতায় কি সুন্দর অভিযান চলিয়াছে। কিন্তু এই বিরাট আয়োজনের মধ্যে আমি যেন একা। আর কখনও একা হইনি।

মনের মাঝে প্রথমে জাগিল ভয়। অপরিচিত জগৎ তার অপরিচয় দিয়া মুগ্ধ ব্যাকুল করিতে চায়।

উপায়হীন।

ভয়ের শিহরণ ধীরে ধীরে থামিয়া যায়। মনে সাহস সঞ্চয় করি।

ভয় ও সাহস এক দোলকের দুই প্রান্ত। একবার ভয় জাগে, আবার সাহস ফোটে।

সেই সাহসের সময় আমার মনে হইল, আমি যেন একা নই— বিশ্বের তৃণে-জলে যে সুর বাজে, আমার চিত্তেও তাহা বাজিতেছে। সমস্ত পৃথিবীর সহিত আমার একান্ত ঐক্য, সেই বিশেষ মুহূর্ত্তে আমার সারা প্রাণ মাতাইয়া তুলিল। বিগতভয় হইয়া আনন্দ-ভরা দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চাহিলাম। এ যেন বরবধূর প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়।

আড়ালে যাহারা থাকে, এক শুভদৃষ্টির যাদুতে তাহারা পরস্পরের পরম আপন হইয়া যায়। অজানা যে ছিল, সে শাশ্বত রসের ভাণ্ডারী হইয়া দেখা দেয়। হৃদয় দিয়া অনুভব করিলাম।

সে অনুভূতি আজিও মনে পড়ে। সকল ঐশ্বর্য্যের জাঁক-জমকের পিছনে পৃথিবীর যে আনন্দ মূর্ত্তি তাহাই তখন দেখা দিল।

নির্ভয়ে অগ্রসর হইলাম।—মানুষ চিরন্তন পথের পান্থ, পথের রেখা যেন তাহাকে চিনিয়া লয়।

পথের রেখা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম।

দূরে চাষীরা চাষ করিতেছে। বলদগুলি উদাস দৃষ্টি মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া রয়।

মানুষ যে কত আপন, তাহা তখন বুঝিলাম। চাষীর উপস্থিতি প্রাণে যেন অপূর্ব্ব আনন্দ ও অভয়ের সৃষ্টি করিল।

পথের বাঁক ফিরিতেই ব্যাং-মামার সহিত দেখা। স্বস্তি জাগিল। ব্যাং-মামা ছিপ লইয়া মাছ ধরিতে আসিয়াছিল। বাঁ হাতে সুতায় করিয়া মাছের রাশি, ডান হাতে ছিপ। ব্যাং-মামা যেন দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিতেছিল!

ডাকিয়া বলিল, "কিরে ভ্যাবা-গঙ্গারাম! কোথায় গিয়েছিলি?"

রাগও হইল, কান্নাও পাইল। কিন্তু কোনটাই সুবিধাজনক নয় মনে করিয়া, চুপ করিয়া রহিলাম।

নিরুত্তর আমাকে খোঁচাইবার জন্য ব্যাং-মামা বলিল, "কিরে! একেবারে যে ধ্যানী মুনি হ'য়ে বসলি!"

ছোট বয়স হইতে ব্যাং-মামা কথায় অলঙ্কার দিত। তাহাকে যাহারা জানে, সবাই একথা হলফ করিয়া বলিবে।

অশ্রুসজল নেত্রে সে দিনের অভিযানকাহিনী বর্ণনা করিলাম।

শুনিয়া ব্যাং-মামা ভারিক্কী চালে উত্তর দিল, "ওদের সঙ্গে তুই হ'স নে, আমার সঙ্গে বেড়াস, তোকে একটা শালিক-ছানা এনে দেবো।"

ছোট বয়সে ভাব, আড়ি কথায় কথায় হয়।

আমিও স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিলাম, বাং-মামারই সাথী হইব।

বাড়ীতে আসিয়া মাছ রাখিয়া ব্যাং-মামা বলিল, "চল, চিলেকোঠায় খেলা কর্‌বি।"

বাদুড় আর স্যাজা আসিয়া বলিল, "না ভাই অজু, রাগ করিস নে, তখন এমন ভয় পেয়েছিল যে কি করি বুঝেই পাই নি।"

বাদুড় বলিল, "আর তুই ছোট ব'লে তোকে কেউ কিছু বলত না, আমাদের পেলে নাস্তানাবুদ ক'রে ছাড়ত।"

স্যাজা বলিল, "সেই জন্যেই ভাগ্নে, দেখনা তাড়াতাড়িতে আমরা অমৃত-ফল ফেলে এসেছি।"

ব্যাং আমার হইয়া বলিল, "ফাজলামি ক'রোনা, তোমাদের বাহাদুরি বেশ ধরা গেছে। ছেলে-মানুষটিকে ফেলে তোমরা সব ধাগীরা পালিয়ে এসেছ।"

আমিও উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, "না ভাই, তোমাদের সঙ্গে আড়ি। বাদুড় ও স্যাজা ম্লানমুখে ফিরিয়া গেল। ব্যাং-মামা হাসিতে লগিল। চিলে-কোঠার একান্ত নির্জ্জনে ব্যাং-মামা আমার সঙ্গে ভাব পাতাইতে আরম্ভ করিল।

ব্যাং-মামা বলিল, "কইরে অমৃত-ফল কোথায় ?"

আমি কোচার খুঁট খুলিয়া বাহির করিলাম। ব্যাং হাতে করিয়া লইল। তাহার পর সতৃষ্ণ-নয়নে ফলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমায় দিবি ?"

আমি এক নিশ্বাসেই উত্তর দিলাম, "না।"

ব্যাং-মামা খানিক থামিয়া অন্য কথা পাড়িল।

"পায়রার ডিম দেখেছিস?"

আমি বলিলাম, "না।"

ব্যাং-মামা বলিল, (যেন আপন মনেই বলিতেছিল।)—"দেখতে কি চমৎকার! হাতে করলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।"

কৌতূহল-ভরে প্রশ্ন করিলাম, "তুমি দেখেছ?"

সে তাচ্ছিল্যসহকারে বলিল, "হ্যাঁ কত, ঐ চিলে ছাদের ফোকরে আছে।"

আমি বলিলাম, "কি ক'রে দেখা যায়?"

"সে ত খুব সোজা, দাঁড়া—তোকে পেড়ে দেখাচ্ছি।"

ব্যাং-মামা অবলীলাক্রমে পুরাতন ছাদের ফাটলে পা দিয়া উঠিয়া পড়িল। পারাবত-মাতা নীড়ে বসিয়াছিল। ব্যাং-মামার তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া ভয়ে উড়িয়া গেল।

ব্যাং-মামা ধীরে ধীরে দুইটি ডিম পাড়িয়া আনিল।

ডিম আমার হাতে দিয়া বলিল, "দেখছিস? কেমন সুন্দর দেখতে!"

ডিম দুটি পাইয়া বারে বারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। তাহার পর আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে বলিলাম, "চল, ওদের দেখাই।"

"কিন্তু আমায় অমৃত-ফলটি দে।"

আমি রাজি নই। সে ক্রোধভরে বলিল, "বা, তোর জন্য কত কষ্ট ক'রে ডিম পেড়ে আনলাম!…জানিস্ ওর ভিতর সাপ থাকে?"

মনে ভয় জাগিল, কিন্তু ব্যাং-মামার যুক্তি বুঝিলাম না। আত্মরক্ষার জন্য বলিলাম, "তোমার ডিম তুমি নাও।"

ব্যাং-মামা অট্টহাস্যে বলিল, "বোকা আর কাকে বলে ? ডিম নিয়ে আমি কি করবো হবুচন্দ্র ? কত ডিম দেখেছি, কাকের ডিম, বকের ডিম, ছাতারের ডিম, গাং-শালিকের ডিম। ও ডিম তোর জন্যই পেড়েছি, তোকেই নিতে হবে।"

"তবে আমায় অমনি দাও।"

"অমনি কি সংসারে কিছু পাওয়া যায়, সব জিনিষের দাম দিতে হয়।"

ব্যাং-মামা এসব পাকামি কোথা হইতে শিখিয়াছিল জানি না। সেদিন রূঢ় ও নিষ্ঠুর লাগিলেও আজ ঠেকিয়া শিখিয়াছি—দাম না দিয়া কোন জিনিষই পাওয়া যায় না।

"তাহ'লে তোমার ডিম চাই না।"

এই বলিয়া ডিম দুটি চাতালে রাখিয়া দ্রুতপদে নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু ব্যাং-মামা চালাক ছেলে। সে ডিম দুটি হাতে করিয়া পিছনে পিছনে নামিয়া আসিল। তারপর আমাকে চিলের মত ছোঁ দিয়া ধরিয়া ফেলিল। ডিম দুটি সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া, আমার হাত হইতে অমৃত-ফল কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিল।

আমি মাটিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম।

সে কি কান্না!

পুত্রশোক-বিধুরা মাতাও হয়ত এরূপ কান্না কাঁদে না। চারিদিকে সোরগোল পড়িয়া গেল।

সবাই ছুটিয়া আসিয়া কহে, "কিরে, কি হ'য়েছে ?"

উত্তর দেয় কে ? কান্নার আওয়াজ দেওয়ালে লাগিয়া দ্বিগুণ হইয়া বাজে। সকলে ভ্যাবাচাকা খাইয়া যায়।

আজা-মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি অজু ?"

আমি কাঁদি আর নাকিস্বরে বলি, "ব্যাং আঁমার অঁমৃতফঁল কেঁড়ে নিঁয়েছে—"

কান্নার মধ্য দিয়া ব্যক্তব্য ধরা মুস্কিল। যখন বহু প্রশ্নে ব্যাপার জানিয়া ব্যাঙের খোঁজ হইল, তখন অমৃতফল ব্যাং-মামার উদরে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে।

ছোটমামা ব্যাং-মামাকে ধরিয়া আনিল।

ব্যাং-মামার মুখ মলিন হইল না। অবশচিত্ত হইয়া সে বিন্দুমাত্র কাঁপিল না। বেশ জোর-গলায় নির্জ্জলা মিথ্যা বলিল, "আমি ওকে ডিম দিয়েছি, ও আমায় ফল দিয়েছে।"

গলার জোর সংসারে অনেক সময় জয় আনিয়া দেয়। ব্যাং-মামার কথায় ছোটমামা কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

আমি ডিম আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে বলিলাম, "মিথ্যে কথা!" কিন্তু সে প্রশ্নের বিচার করিতে গেলে মুস্কিল। আজা-মহাশয় তাই বলিলেন, "আচ্ছা, তুই কাঁদিস নে, তোকে এককুড়ি অমৃতফল এনে দিচ্ছি।"

আমি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম আর বলিলাম, "আঁগে দাঁও!" মা এতক্ষণ ছিলেন না; আসিয়া পৌঁছিলেন। মাকে দেখিয়া আমার গলার জোর কমিল, কিন্তু কান্না থামিল না।

আজা-মহাশয় বলিলেন, "কাঁদিস নে দাদু, এখুনি লোক পাঠাচ্ছি।"

মা কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। খাবার দিয়া ভুলাইতে চাহিলেন। আমি রাগে গর-গর করিতে করিতে বলিলাম, "অমৃতফল চাই, তবে ভাত খাবো।"

ছোট বয়সে রাগিলে 'ভাত খাইব না বলিয়া ভয় দেখাইতাম। মাতা কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

চাকর-বাকর দিকে দিকে ছুটিল। কিন্তু অমৃতফল কোথাও মিলিল না। অমৃতফল তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। খাল বিল মাঠ ঢুঁড়িয়া চাকরেরা গৃহে ফিরিল, সকলের মুখেই নিরাশার বাণী।

না খাইয়া ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বৈকালে বাদুড় ও স্যাজা চুপি চুপি আসিয়া বলিল, "আমাদের সঙ্গে ভাব করবি ভাই?"

আমি বলিলাম, "না।"

বাদুড়-দাদা বলিল, "ভাব যদি করিস, তবে সে দুটি অমৃতফল কুড়িয়ে আনি।"

স্যাজা মামা বলিল, "লক্ষ্মী! রাগ করিস না, আর কখনও তোকে ফেলে পালাবো না।"

সময়ই মনে শান্তি আনে। সকাল বেলার দৌরাত্ম্য আর ইন্ধন না পাইয়া নিভিতে বসিয়াছিল।

কাজেই বাদুড় ও স্যাজার সহিত ভাব করিয়া লইলাম। কিন্তু সে অমৃতফল তাহারা খুঁজিয়া পায় নাই। পথচারী রাখালবালক হয়ত কখন কুড়াইয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল।

বড় হইয়া আরও মামা বাড়ী গিয়াছি। কিন্তু তখন অন্য চিন্তা মন ব্যাপিয়া ছিল, কাজেই অমৃতফলের সন্ধান হয় নাই।

তাহার পর জীবনের চল-চঞ্চল স্রোতে, পৃথিবীর কত ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়াছি—কত লেনা-দেনা, কত মেলা-মেশা করিয়াছি, কিন্তু অমৃতফলের পিপাসা জাগে নাই।

ছোট বয়সের এ ইতিহাস আজ ভাবিলেও হাসি পায়! কিন্তু সেদিনের সে কান্না কি জীবনে ব্যর্থ হইয়া যাইবে? অমৃতত্বের আস্বাদ কি জীবনে মিলিবে না?

কে জানে! আশার কথা এই, কবি ও বৈজ্ঞানিক বলেন, সংসারে কিছু হারায় না। সেদিনের বেদনা তাই মিথ্যা নয়, কারণ—

'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।'

—— ০ ——
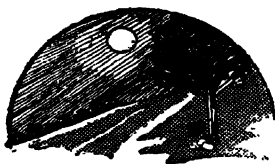
ভোজের নিমন্ত্রণ।

ঠাকুরমার বাপের বাড়ী, পাশের গাঁয়ে। আত্মীয় বাড়ী হইতে বাড়ীর সকলকে লইবার আহ্বান আসিয়াছিল। ঠাকুরমার না গেলে চলে না, খুড়িমারা কেহ বাড়ীতে নাই কাজেই মাকে বাড়ী থাকিতে হইল।

আমি বলিলাম, "আমি যাব।"

ঠাকুরমা বলেন, "না দাদু, মাকে ফেলে তুমি থাকতে পারবে না।" সে কথা শুনিতে মন চায় না। কল্পনায় নিমন্ত্রণ গৃহের লুচিমণ্ডার ছবি দেখি, চিত্তকে কিছুতেই থামাইতে পারি না।

মা বলেন, "আমার জন্য মন কেমন করবে না অজু?"

করিবে জানি, কিন্তু সে কথা স্বীকার করা চলে না, ফলারের কৌতুক ও আমোদ মায়ের ভালবাসা ছাপাইয়া ওঠে। মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলি, "না মা! তুই কিছু মনে করিস না, আসবার সময় তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে আসব।"

আমার পাকামিতে মা হাসিয়া উঠিলেন। সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহ সন্দেশের তুল্যমূল্য নহে, একথা তখন বুঝি নাই।

অনর্থ ও ক্রন্দনের হাত এড়াইবার জন্য বাড়ীর লোকে রাজি হইলেন। পূজার সময় ঠাকুরদা তাঁতের ধুতি ও দোলাই কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহাই গায়ে দিয়া বিজয়ী বীরের মত দিগ্বিজয়ে চলিলাম।

বাড়ী ছাড়াইয়া গাঁয়ের মনসাতলা।

মনসা পূজার উৎসব দেখিয়াছি, ঠাকুরমার মুখে মনসার ভাসান শুনিয়াছি। চলিতে চলিতে ভয়ে শিহরিয়া উঠি।

চাঁদসওদাগরের কথা মনে জাগে। সাপের বিচিত্র বর্ণনা মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। ঠাকুরমাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, "ঠাকুরমা! মনসাতলায় কি সাপ থাকে?"

ঠাকুরমা অভয় দিয়া বলেন, "না সাপ থাকবে কেন? যেদিন লোকে দুধকলা দিয়ে যায়, সেদিনই কেবল মা মনসা এসে খেয়ে যান।"

রায়েদের বাড়ী ছাড়াইয়া হাট। হাটের পাশ দিয়া পথ—শূন্য চালাগুলি প্রভাতের রৌদ্রে ঝলমল করে।

একটী গরুর গাড়ী মাল বোঝাই করিয়া সহরে চলিয়াছে। গাড়ীর গাড়োয়ানকে বলি, "আমায় একটু উঠিয়ে নাও না।" গাড়োয়ান শান্ত শিষ্ট লোক, তুলিয়া লয়। পথের পাশের মোড়ে নামাইয়া দেয়।

ঠাকুরমা পিছনে পড়িয়া যায়, আমি দাঁড়াইয়া পাখীর খেলা দেখি।

গাছের পাতার মাঝে, একটী দোয়েল বসিয়া শিস দিতেছিল, তাহাকে তাড়া করিতেই দাঁতন গাছের ঝোপে লুকাইল। যাইয়া দেখি দোয়েলের বাসা, খড়কুটা দিয়া পাখী অতি সুন্দর নীড় নির্ম্মান করিয়াছে। আমাকে দেখিয়া দোয়েল ভয়ে উড়িয়া গেল, নীড়ের ভিতর তিনটী ডিম রহিয়াছে, লইবার লোভ হইল, কিন্তু পরদুঃখকাতরা ঠাকুরমা নিশ্চয় বকিবেন, এই ভয়ে ডিম লইলাম না। দাঁতনের ফল ফলিয়া রসে ভরপূর ছিল, তাহাই তুলিয়া লইয়া মনের উল্লাসে খাইতে আরম্ভ করিলাম।

ঠাকুরমা আসিয়া পড়িলেন। দাঁতনের ফল আমার কাছে রসগোল্লার চেয়ে মিষ্ট লাগিতেছিল। ঠাকুরমাকে বলিলাম, "ঠাকুরমা তুমি খাবে?" বৃদ্ধার রসনায় দাঁতনের ফলের কোন মূল্যই ছিল না, আর পথের মাঝে বসিয়া খাওয়ার আনন্দও তাঁহার ছিল না। তাই ঠাকুরমা খাইলেন না। আমার দুঃখ হইল। ছোট বয়সে মানুষ

স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে। আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি তাহার অতি প্রবল, তথাপি মাঝে মাঝে দান করিবার ইচ্ছা যে জাগে না তাহা নহে।

ঠাকুরমাকে বলিলাম "এইখানে পাখীর বাসায় ডিম আছে—দোয়েলের ডিম।"

বুড়ীর তাহাতে উৎসাহ জাগে না, দমিয়া যাই। খানিক পরে ঠাকুরমা বলেন, 'না দাদু, পাখীর ডিম নিতে নেই। শোন্ একটা গল্প বলি,—"সত্যিকালের যুগে একটা বনচালিতার গাছে, এক দোয়েল ডিম পেড়েছিল, এক কাক এসে তার ডিম ভেঙ্গে দেয়, দোয়েল গিয়ে পাখীর রাজার কাছে নালিশ করল। তখন সভা হ'ল, বিচার বসল, পাখীর রাজা ব্যবস্থা করলেন যে কাকের রঙ কালো হয়ে যাবে, আর লোকে তাকে দুচক্ষে দেখতে পারবে না।" বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করি "সত্যিযুগে তাহলে কাক সাদা ছিল?"

ঠাকুরমা বলেন, "ছিল বইকি, ক্ষীরের মত রঙ, চাঁপার মতন ঠোঁট, কাক তখন সাদা বকের চেয়েও ধব-ধবে, আর সুন্দর ছিল, কিন্তু অন্যায় করার ফলে কাকের গুরু শাস্তি হয়েছে।"

যখনই কোন নীতি-শিক্ষা দেওয়ার দরকার হইত, ঠাকুরমা উপদেশ দিতেন না, ঈশপের মত গল্প করিতেন আর আমি স্তব্ধ হইয়া সেই কাহিনী শুনিতাম। কালের স্তব্ধ সমুদ্র পাড়ি দিয়া, সেই সমস্ত কাহিনী ঠাকুরমার হারানো কণ্ঠস্বরে মাঝে মাঝে মনের দ্বারে সাড়া দিয়া যায়।

অবশেষে ঠাকুরমার বাপের বাড়ী পৌছিলাম। চৌধুরীরা গাঁয়ের বর্দ্ধিষ্ণু লোক; সেকালের দিনে ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া লোকে সম্মান প্রতিপত্তি করিত। বিলাস-ব্যসনের দিন আজ বাড়িয়া চলিয়াছে। নিজের

কাজ শেষ করিয়া মানুষ আজ অপরকে আনন্দের অংশ দিতে পারে না।

ভোজের বাড়ী, মানুষে মানুষে সরগরম। কত গাঁয়ের কত লোক আসিয়াছে, মেয়েরা বাপের বাড়ী আসিয়াছে, কুটুম্বিনীর দল দিন কয়েকের জন্য হাতা বেড়ী ফেলিয়া আনন্দের অবকাশ যাপন করিতে আসিয়াছে। ঠাকুরমা আসিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। আমারই মহামুস্কিল হইল। বহু জনতার মধ্যেও মানুষের মনে নির্জ্জনতার বেদনা জাগে, আমিও অপরিচিত ছেলের দলের মধ্যে নিজেকে মিশাইতে না পারিয়া অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। বাড়ীর জন্য মন উতলা হইয়া ওঠে, মায়ের বেদনা-ভরা অনুনয়ের কথা মনে জাগিতে লাগিল।

কলরব ও কোলাহলের মধ্যে কয়েকদিন চলিয়া যায়। ঠাকুরমা কাজ করেন আর মাঝে মাঝে আমার তদারক করেন। বৈকাল বেলা ভাঁড়ার হইতে সন্দেশ চুরি করিয়া, ঠাকুরমার ছোট ভাইয়ের ছেলে সঞ্জয় বলিল, "চল, মাঠে গিয়ে লুকিয়ে খাওয়া যাবে।"

আমি দলে ভিড়িয়া গেলাম। সাধারণ ভাবে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই মন মুগ্ধ হয় না, মানুষ তাই নিত্যদিন উত্তেজনার সন্ধান করিয়া ফেরে।

ধানের মাঠে ধান নাই, সবুজ ঘাসে ভরিয়া গিয়াছে, তাহারই পাশে শাখাপ্রশাখায় ভরা বনস্পতি বট, মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। তাহারই তলে সন্দেশ ভাগের আয়োজন হইল। দলের সর্দ্দার সঞ্জয় আমাকে আমলই দেয় না, চোরের দলে নই, বলিয়া আমাকে সন্দেশের ভাগ অল্প দিতে চায়।

কিন্তু এ ব্যবস্থা আমার মনঃপূত নয়। আমি কষ্টের ভাগী না হইয়াও পুরস্কারের সমভাগী হইতে চাই, ইহা সঞ্জয়ের মতে সমীচীন নয়, কিন্তু আমি সে কথা বুঝিতে চাই না।

সঞ্জয় তাই আমায় ভাগাইয়া দিল। আমিও রাগে ও ক্ষোভে একলা ফিরিলাম। পথে একটা এদোঁ পুকুরে দেখি পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরমার কাছে পদ্মবনের মাঝে শায়িতা নায়িকার কাহিনী শুনিয়া পদ্মবনের উপর আমার মনের মোহ জন্মিয়াছিল।

তাই সঞ্জয়ের নিকট অপমানের কথা ভুলিয়া পদ্ম তুলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঘাসে-ছাওয়া পাড়ে নানা বনজ ঘাস ও লতা জন্মিয়া মনোহর আস্তরণ তৈয়ার করিয়াছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া কঞ্চি দিয়া পদ্ম টানিয়া ভাঙ্গিতে বসিলাম।

কঞ্চির 'কোটা' দিয়া পদ্ম টানিতে কসরতের প্রয়োজন, সে কসরতে আমি অভ্যস্ত নই, তথাপি মানুষের উৎসাহ মানুষকে কৌশল ও দক্ষতা শিখায়।

উল্লাসে ও আগ্রহে ৪।৫টী পদ্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। তাহার পর পুনরায় যেই তুলিতে গিয়াছি, অমনি কঞ্চিতে বাধিয়া একটা সাপ ডাঙ্গায় আসিয়া পড়িল। সাদা ও হলুদ রঙ্গের ডোরা দেওয়া সে সাপ হয়ত বিষহীন ঢোঁড়া ছিল, কিন্তু সহায়হীন একা আমার প্রাণ যেন উড়িয়া গেল, সাপ পড়িয়া ঘাসের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া গেল। আমি ত্রাসে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। খানিক পরে আত্মস্থ হইয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলাম, মরণের ভয়েও পদ্ম ছাড়িতে পারি নাই, পেলব গন্ধ-মধুর পদ্মগুলি হাতে করিয়া, লম্বমান একটি বাঁশ ধরিয়া পাড়ের উপর পৌছিলাম।

কিন্তু মাটিতে পা দিতে সাহস হয় না। সাপের আতঙ্কে চারিদিক সাপ দেখিতে লাগিলাম। মহাভারত ও মনসার ভাসানে সাপের যে সব বর্ণনা পড়িয়াছিলাম মনের মধ্যে তাহা জাগিয়া উঠিল।

খানিক পরে দেখি, সাপ আপন প্রাণ-ভয়ে ঘাসের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে জলে যাইয়া পড়িল। তখন লাফ দিয়া মাটীতে পড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে ঠাকুরমার কাছে পৌছিলাম।

দুঃসাহসিক কাজে আমাদের অভিবাবকেরা পূর্ব্বে কখনও উৎসাহ দিতেন না; সুশীল ও সুবোধ হইবার সাধনা আমাদের ছিল, অকাজ করিতে দিতে কল্যাণার্থী গুরুজন চিরকালই নারাজ, কাজেই ঠাকুরমার নিকট বকুনি খাইলাম।

বকুনি মিষ্টমধুর ছিল, তাই তাহার বেদনার ঝাঁঝ মনের উপর দাগ দিয়া গেল না, পদ্মগুলি বাড়ী নিয়া মাকে দেখাইবার লোভ মনে জাগিল, তাই ঠাকুরমা ও আমি যে ঘরে শুইতাম, তাহার মধ্যে সিকার পরে হাঁড়ির মধ্যে সেগুলি লুকাইয়া রাখিলাম। লুকাইবার অন্যস্থান খুঁজিয়া পাইলাম না, এখনকার মত বাক্স ও সুটকেশ তখনকার দিনে রেওয়াজ হয় নাই।

সঞ্জয়েরা ফিরিল। তাহাদিগকে আমার পদ্ম আহরণের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। নিজের গৌরব বাড়াইবার জন্য বলিলাম, "জানিস্ সে পদ্মবনে বড় এক সাপ আছে, আমায় ত তেড়ে এসেছিল, আমি কোনক্রমে পালিয়ে এসেছি, আর আসবার সময় তার এক বাচ্চাকে কঞ্চি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছি, ও মুখে তোরা কেউ আর যাস না।" নিজে যাহা করি, চিরকাল মনে করি অপরে তাহা তেমনভাবে কখনই করিতে পারে না। কিন্তু সঞ্জয় তুখোড় ছেলে,

সে না দমিয়া উত্তর দিল "তোর সাপ আমায় দেখলে বাপ বাপ করে পালাবে, ও পুকুরে ত আমরা রোজই পদ্ম তুলি।"

সঞ্জয়ের সঙ্গী বলিল, "তুই পদ্ম আনিস নি, মিথ্যে কথা বলছিস ?'

আমি ইহাদের দুষ্টবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছিলাম। চাণক্যনীতি শঠে শাঠ্যম্ অনুসরণ করিয়া বলিলাম, "তোদের দেখাই আর তোরা চুরি করে নে ?"

সঞ্জয় ইহাতে আপন নেতৃত্বকে অপমানিত হইয়াছে মনে করিয়া বলিল "তোর পদ্ম কে দেখতে চায় ? কাল দুঝুড়ি এনে তোকে দেখাব, কিন্তু পদ্ম আনা তোর কর্ম্ম নয়।

নিরুপায় আমি কি করিব ভাবিয়া পাই না। শঠকে ধন-ভাণ্ডার দেখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তে ঘর করা চলে না, কাজেই নিরুত্তর রহিলাম। একটী ছোট মেয়ে পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে আমার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বেদনার্ত্ত হইয়া বলিল "না সঞ্জয়দা, ও পদ্ম এনেছে।"

সঞ্জয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সদলবলে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে আমার রক্ষাকর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম।

মেয়েটীর হাসি ভরা মুখ। নানা বিক্ষেপভরা সারা দিনের অশান্তির পরে লাবণ্য-ললিত মেয়েটীর মুখ আমার মনে অনেকখানি আনন্দ আনিয়া দিল। সেই আনন্দে আমার মনকে সজাগ করিয়া তুলিল। আমি তৃপ্তচিত্তে বলিলাম "এই, তোর নাম কি ?"

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, শ্লোক আওড়াইয়া উত্তর দিল 'নাম দিয়ে তোর কাম কি" ?

মেয়েটীর এই পাকামি ভরা উত্তর আমাকে ক্ষুব্ধ করে নাই। তাহার সঙ্গে ভাব পাতাইবার জন্য বলিলাম, "তোকে একটা ভাল পদ্ম দেব, বল না, তোর কি নাম?

উৎসবের মূর্ত্ত সুরের মত সে মেয়েটী। সে উত্তর দেয় না, শ্লোক পড়িয়া যায়—

"নীল সায়রের কোলে,
অশথ-পাতা দোলে,
ওগো তুমি কোন্ সে রাজার ঝি?
বল না মোরে নামটী তোমার কি?"

হার মানিয়া জানাই "ওগো পাকা বুড়ি, তোমার সঙ্গে ছড়া কেটে আমি জিতব না"

ভোরবেলা শিশির-ভরা গোলাপ-কুঁড়ির মত মাথা দোলাইয়া মেয়েটি বলে:—

"সবুজ পাতায় কুন্দকলি,
নই গো আমি নই,
শিউলি আমি শিউলি,
ঠিক ত কথা কই।"

শিউলি মেয়েটীর তর-তরে চলন, আর ঝর-ঝরে কথা আমায় মুগ্ধ করিয়া দিল, তাহাকে নিয়া আমার রত্ন-মঞ্জুষা দেখাইলাম ও সাবধান করিয়া দিলাম যেন সে অপর কাহাকেও সন্ধান না দেয়। শিউলি তাহার কথা রাখিয়াছিল, সে কাহাকেও বলিয়া দেয় নাই কিন্তু সঞ্জয়ের দল চতুরতায় শিউলি ও আমার উপর টেক্কা দিল। তাহারা এক ফাঁকে আমার পদ্মগুলি চুরি করিয়া লইয়া গেল।

পদ্ম অপহরণে আমার দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না, কিন্তু শিউলি বলিল, "কেঁদে কোন লাভ নেই, ওরা তাতে কেবল হাসবে।" শিউলির কথা আমার অন্তর স্পর্শ করিল। 'অমৃত-ফল' হারাইয়া যে কান্না কাঁদিয়াছিলাম, তাহার পিছনে আবদারের তাড়না ছিল, কিন্তু পরের বাড়ীতে কান্নাকাটি করা শোভন হইবে না ইহা বুঝিয়াছিলাম! নিজের দুঃখ নিজে বহন করিতে পারাই জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিষ। ভিক্ষুকের মত অপরের সহানুভূতি যাচ্ঞা করায় দুঃখ বই সান্ত্বনা নাই। বড় হইয়া বহুবার ঠেকিয়া শিখিয়াছি, তাই শিউলির এই তুচ্ছ ছোট কথাটিও কালের স্রোতে হারাইয়া যায় নাই। শিউলিকে সাথী পাওয়ায় আমার যে আনন্দ হইয়াছিল ভাষায় তাহা প্রকাশ করা চলে না। চঞ্চল, লঘু, হাস্যচটুল এই ছোট মেয়েটি ঝর্ণার মত চারিদিকে উৎসবের সুর ছড়াইয়া দিতে পারে, তাই তাহার সঙ্গ পরম কামনার ধন।

শিউলি আমার সাথে ভিড়িয়াছে, তাহাতে সঞ্জয়ের দলের রাগ হইল। পদ্ম চুরির পর তাহারা বিষম একটা হৈ চৈ হইবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইয়া তাহারা কলহের সুযোগ খুঁজিতেছিল। বিকাল বেলায় লুকোচুরি খেলিবার সময় শিউলি যখন খেলিতে চাহিল, তখন সঞ্জয় জোরের সহিত বলিল, "না তোকে নিয়ে আমরা খেলব না।"

শিউলি দমিবার মেয়ে নয়, সঞ্জয়ের দলকে সে ভয় করিয়া চলে না। সে, আমি আরও দু'একজনে একত্রে খেলিয়া, অপমানের প্রতিশোধ লইলাম, কিন্তু লোক কম হওয়ায় আমাদের খেলা জমে না।

শিউলি হয়ত আমার জন্য কষ্ট পাইতেছে ভাবিয়া সন্ধ্যা বেলায় শিউলিকে বলিলাম, "শিউলি, তুই না হয় ওদের সঙ্গে হ,' আমি রাগ করব না।" খোলা বারান্দায় চাঁদের আলোর সোনালিতে ঝলমল, শিউলি আমার কথার উত্তর না দিয়া শ্লোক বলিয়া যায়,

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে,
শূন্য ঘরে কে?
দোহুল দোলায় দোল লেগেছে,
দুলবি ওরে কে?

তারায়-ভরা আকাশ, কাজের বাড়ীর সমস্ত ভিড় ভুলাইয়া মনকে টানিয়া লয়। শিউলির মন যেন প্রকৃতির সাথে এক তারেতে বাঁধা তাই সে সন্ধ্যার সেই অসীম পূর্ণতার কাছে আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিল। আমি পুনরায় বললাম "ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই।"

অসহিষ্ণু হইয়া শিউলি উত্তর দেয় "ঝগড়াঝাঁটী এখন থাক, তুমি একটী রূপ-কথা বলনা।"

ঠাকুরমার কাছে শেখা গল্প বলি—"এক যে ছিল রাজা—তার হাতী শালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজার এক ছেলে বড় আদুরে। রাজপুত্তুর বড় হয়ে একদিন কাঁকনবাঁকা নদীতে গেছেন স্নানে, এমন সময় কালো কুচ কুচে এক গাছি চুল--

শিউলি হাসিয়া বলে "কুঁচবরণ কন্যে, আর মেঘবরণ চুল— "সেই গল্প ত, ও আমি জানি। তুমি না হয় ছড়া বল অজিত দা!" জানা ছড়া আওড়াই, চাঁদের আলো শিউলির কালো চুলে লুকোচুরি খেলে, শিউলির মা আসিয়া ডাকে, শিউলি চলিয়া যায়।

পরের দিন ভোজ—চারিদিকে কেবলই গণ্ডগোল। কাজ যত লোক করে, তার চেয়ে বেশী লোক গণ্ডগোল করে। ফপরদালালদের আস্ফালন ও উৎসাহে কান-পাতাই ভার।

সারা সকালের মধ্যে শিউলির দেখা নাই, শিউলির কাকা আসিয়াছে, শিউলি তাহার কাছেই বেড়াইয়া বেড়ায়!

খানিক পরে ঠাকুরমা আসিয়া বলেন, "যাও ত দাদু, তোমার বাবা এসেছেন, তাকে ডেকে নিয়ে এস।"

বাবার খোঁজে বাহির হইলাম, বাহিরের উঠানে সামিয়ানা টানাইয়া বসিবার স্থান করা হইয়াছে—সেখানে লোকে লোকারণ্য। তাহার মধ্য হইতে বাবাকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে স্থির করিলাম, লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া বাবাকে বাহির করিব।

বুদ্ধি করিয়া স্থির করিলাম, বাবার নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয় ও সমীচীন, কারণ কেহই আমাকে চিনে না। অতএব বৃথা অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কেউ বিজয় রায়কে দেখেছ?"

প্রশ্নটী শিশুবালকের মুখে খারাপই শোনায়, কিন্তু আমি এই প্রশ্ন নিজের বুদ্ধির বাহাদুরির জ্ঞাপক ভাবিয়া নির্ভীকচিত্তে সেই জনসভায় একজনের পর আর একজনকে প্রশ্ন করিয়া চলিলাম।

জনতার মধ্যে কেহ কেহ পিতাকে চিনিত। তাহারা আমার এই অপূর্ব্ব প্রশ্ন শুনিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহাদের হাসির কারণ বুঝিতে না পারিয়া, আমি হতভম্বের মত চাহিয়া রহিলাম।

বাবা কোথায় ছিলেন, ঘটনাস্থলে আসিয়া আমায় বলিলেন, "কি খোকা ?"

আমি ঠাকুরমার প্রদত্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

সকলের কৌতুকোজ্জ্বল হাসির মধ্য দিয়া পিতা-পুত্র বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলাম। সঞ্জয়ের দল কোথা হইতে এই খবরটী শুনিয়াছিল। আমার সহিত দেখা হইবামাত্র, তাহাদের একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "তোমরা কেউ বিজয় রায়কে দেখেছ ?"

নিজেকে অপরিচিত জানিয়া, পিতার নাম ধরিয়া প্রশ্ন করাকে সঞ্জয়ের দল বুদ্ধিমত্তার উদাহরণ মনে না করিয়া, উপহাসের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে, ইহাতে আমি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিলাম।

বাবাকে দেখিয়া, আর এই সব উপদ্রবের জন্য আমার মন বাড়ী ফিরিয়া গেল। মায়ের স্নেহমধুর আমিয়ধারার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলাম। ঠাকুরমাকে যাইয়া বলিলাম, "ঠাকুরমা আমি বাড়ী যাব।"

ঠাকুরমা বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কেন ? আমি একলা কি করে থাকব ?"

আমি বলিলাম, "তা আমি জানিনা।"

ঠাকুরমা বাবাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ভোজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় অজিতকে নিয়ে বাড়ী যাস্, ও আর থাকতে চায় না।"

বাবা বলিলেন, 'আচ্ছা'।

বিকাল বেলায় শিউলিকে একা পাইয়া বলিলাম, "শিউলি আমি বাড়ী যাচ্ছি।" পড়ন্ত রৌদ্র তার ডালিম-রঙা মুখকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, সে হাসি হাসি ভাবে বলিল। "কেন ?"

"ওরা আমায় খেপাচ্ছে, আর মায়ের জন্য আমার মন কেমন করছে ?"

শিউলি গম্ভীর হইয়া শুনিল, পরে হাসিতে হাসিতে শ্লোক আওড়াইল।

"শাক তুললাম খুঁটেমুটে,
বেগুন তুললাম জ্বালি,
শিশু মেয়ের বিয়ে দিয়ে,
ঘর করলাম খালি।
কচি মেয়ে দুধের সর,
কেমনে করবে পরের ঘর ?

বিদায়-কালে তাহার এই ব্যঙ্গ আমার কাছে কঠিন লাগিল, আমি রুষ্ট হইয়া উঠিলাম, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, "যাও তোমার সঙ্গে আড়ি।" হাসির বাষ্প-ভরা মেয়ে শিউলি, যতই থামাইতে যাই, ততই তাহার হাসি আর কৌতুক উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, সে পুনরায় বলে,

আড়ি, আড়ি, আড়ি
কোথায় তোমার বাড়ী ?
সাগর দিনু পাড়ি,
কেম্‌নে যাবে ছাড়ি।

এই বলিয়া করুণা-মাখা স্বরে আমার পানে চাহিল! ইহার পরে রাগ বা অভিমান চলে না; আমি বলি, "শিউলি আমায় মনে রাখবে ? আমার ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে তোমরা আসবে বুঝলে ত? বাবাকে বলে তোমাদের নিমন্ত্রণ করাব।"

শিউলি হাসিয়া হাসিয়া উত্তর দেয়। "কিন্তু তোমার বাবা যদি নিমন্ত্রণ না করেন ?—"

"বা ! আমি বললে নিশ্চয়ই করবেন !"

"আচ্ছা তাহালে না হয় যাব, কিন্তু তুমি যদি ভুলে যাও?" "না কখনই ভুলব না।"

গল্পে রাজার ছেলে যখন রাক্ষসদের হাত থেকে, রাজকন্যাকে উদ্ধার করিবেন সংকল্প লইয়া বিদায় নেন, তখন যে শপথের ছড়া বলেন, ঠাকুরমার কাছে শোনা সেই ছড়া পড়িয়া বলিলাম :—

"বলছি তোমায় সত্যি করে,
ওগো রাজার ঝি !
ভুলব নাকো ক্ষণিক তরে,
ভুলতে পারি কি ?

ছড়ায় উত্তর শুনিয়া শিউলি এবার আমায় মহা-সম্ভ্রম করিল, ধীর মধুর বচনে বলিল, "অজিতদা, আচ্ছা যাব।"

বাবা আমার খোঁজে আসিয়া পড়িলেন, বাবাকে দেখিয়া মহা-আনন্দে বলিলাম, "বাবা, খোকার ভাতের সময় শিউলিকে নিয়ে যেতে হবে।"

বাবা সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, কিন্তু তুই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে, শেষে রাত্রি হয়ে যাবে।"

কাপড় চোপড় পরিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া যখন বাহির হইব, তখন দেখি শিউলি হাতে একরাশ পদ্মফুল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে আমাকে পদ্মফুল দিয়া বলিল, "এইবার দুঃখ ঘুচেছে ত ?"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। পদ্ম হারাইয়া যে কি গভীর দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, একমাত্র শিউলিই তাহা অনুভব কয়িয়াছিল, আমি চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া শিউলি সঞ্জয়কে দিয়া নূতন ফুল তুলিয়া

আনিয়াছিল। সঞ্জয় শিউলির কাছ হইতে মস্ত কিছু ঘুস লইয়া একাজ করিয়াছিল। শিউলির একটা রবারের পুতুল ছিল, সঞ্জয়কে তাই দিয়া সে ফুল যোগাড় করিয়াছিল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন করে আনলে ?"

শিউলি হাসিয়া বলিল, "তা শুনে কি হবে অজিত দা!"

এই বলিয়া সে বিদায় লইয়া গেল।

সঞ্জয়ের একজন সঙ্গীর কাছ হইতে সংগ্রহের ইতিহাস পাইলাম। বাড়ী ফিরিবার জন্যে মনে উল্লাস ছিল, কিন্তু শিউলির কথা মনে পড়ায় রাস্তার নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যের উপাদানের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিলাম।

গোধূলির আলো মিলাইয়া যায় যায়। বাড়ীর মাঠে ছেলেরা তখনও চু-কপাটী খেলিতেছিল, আমরা বাড়ী পৌঁছিলাম।

মা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই অজু সন্দেশ কই ?"

মাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করি নাই ভাবিয়া লাঞ্ছিত হইলাম। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া বলিলাম, "মা তোমার জন্যে পদ্ম এনেছি"

কুটুম্ব-গৃহ হইতে মিষ্টান্ন-দ্রব্যাদি দিয়াছিল, কিন্তু তাহা সংগ্রহে আমি কোনই উৎসাহ দেখাই নাই। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পদ্ম পেয়ে কি সন্দেশের ক্ষিদে মেটে ?"

আমি লজ্জা-বেপথুমান কণ্ঠে বলিলাম, "এ পদ্ম মা শিউলি দিয়েছে।"

মা বলিলেন, "শিউলি কে ?"

মুস্কিলে পড়িলাম, শিউলির পরিচয় সংগ্রহ করি নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব আর নাম দিয়া তাহাকে ধরা যায় না।

আমি বলিলাম, "বড় খাসা মেয়ে শিউলি!"

পাশের বাড়ীর ঠানদি মিষ্টান্নের লোভে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "কেন তাকে বিয়ে করবি নাকি?"

আমি রাগিয়া উত্তর দিলাম "দূর!"

সন্ধ্যা লাগে লাগে।

গোধূলরি স্বর্ণ-ছায়া খেলার মাঠে যেন কাঁচা সোনা ছড়াইয়া দিয়াছে। আমাদের সাত-সরিকের বড় বাড়ীর সমুখে বড় মাঠ। বেলা-শেষে সেখানেই ছেলের দলের মজলিস জমে।

বালির কাগজ, তলদা বাঁশের চিকণ চটা আর 'বলা'র আঠা দিয়া মণিদা "দোয়ারী চিলে" তৈয়ারী করিয়াছিলেন। নীল আকাশের শান্ত সমাহিত পুরভবনে সেই বৃহৎ ঘুড়ির বাঁজখাই শব্দ সমস্ত শিশুমনকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। আমরা নিস্পলক নেত্রে আকাশে ঘুড়ির অবাধ লীলা-খেলা অবাক বিস্ময়ে দেখিতেছিলাম।"

অতি সন্তর্পণে মণিদাকে বলিলাম, "দাওনা দাদা! একবার লাটাইটা আমার হাতে দাওনা।"

বিজ্ঞের ভাণ করিয়া দাদা উত্তর দিল, "হাঁ তা হলেই হয়েছে, সমস্ত জড়া-ঘড়া বেধে যাবে।"

মণিদার অবহেলা আমার সমস্ত অন্তরকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। আমি আমার সঙ্গীদের ডাকিয়া বলিলাম, "চল্‌রে, ঘুড়ির আর কি দেখবি।"

কথামালার শিয়াল ঠেকিয়া শিখিয়াছিল যে আঙ্গুর ফল টক। আমাদেরও জীবনে বহুবার শিয়ালের মনস্তাপ সহিতে হয়।

একপাশে যাইয়া সন্ত-পতিত গুবাক-পত্র নাচাইতে নাচাইতে আমরা ঝিঁঝিঁ ধরিবার মন্ত্র আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। মন্ত্রের মধ্যে যাদু আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের কোলাহলের ঐক্যতান মুগ্ধ ঝিল্লীকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলে। সুরের যাদু তাহাকে মৃত্যু-মুখে টানিয়া লয়।

আমরা সকলে একত্র গাহিতে লাগিলাম—

"গুয়োর পাতা নড়ে চড়ে,
ঝিঁঝিঁর মাথায় টনক পড়ে।
ও ঝিঁঝি! তোর মাকে,
দেখবি যদি আয়।"

ঝিল্লীর মাতৃভক্তির দরদ কতখানি জানি না। কোনও প্রাণীতত্ত্ববিদ্ এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা জানি না, তবে আমাদের মন্ত্রের মৌতাতে ঝিঁঝিঁ বেচারী প্রাণ হারায়। কোঁচার আঘাতে সুন্দর পতঙ্গগুলি আমাদের কৌতুকের ও উল্লাসের সামগ্রীতে পরিণত হয়।

খেলা কতক্ষণ চলিত জানি না। কিন্তু মণিদা বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিয়া বলিল, "বাড়ী পালা,—ঝড় আসছে।"

চাহিয়া দেখি শ্রাবণ-আকাশের ঈশাণ-কোণে কৃষ্ণমেঘের ঘন-ঘটা। কালো মেঘের জমাট কালো রূপে চোখ জুড়াইয়া যায়। মণিদা জোরে জোরে লাটাই জড়াইতেছিল, কিন্তু ঘুড়ি নামাইবার পূর্ব্বে দমকা বাতাস মাতাল ঘোড়ার মত ছুটিয়া আসিল। মণিদার সাধের ঘুড়ি বাতাসের ঝাপটায় মাটীতে ঘা খাইয়া চৌচির হইয়া গেল।

আমরা সবাই ঝড়ের ধূলা বুকে মাখিয়া তাথৈ নৃত্য আরম্ভ করিলাম, আর মণিদাকে ভ্যাংচাইয়া বলিতে লাগিলাম, "বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে।" ঈর্ষ্যা মানুষের মনের আদিম সয়তানদের অন্যতম। মানুষ তাই পরের ভাল দেখিতে পারে না। অপরের কুশলে আমার গাত্রজ্বালা স্বাভাবিক পশুধর্ম্ম। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক পশুধর্ম্মের সংস্কৃতরূপ। অপরে ভাল হইয়াছে, আমিও ভাল হইব, এই বাসনা

সহজে মানুষের মনে জাগে না। মানুষের কৃষ্টি বহুসাধনায় আপনাকে নির্ম্মল করিতে পারিয়াছে।

মণিদা হয়ত এই কৌতুকের শাস্তি ভাল ভাবেই দিত, কিন্তু ঘুড়ির মায়া তাহার মনকে কাতর করিয়া রাখিয়াছিল।

আমরা ঝড়োহাওয়ার মধ্য দিয়া ঘরের পানে ছুটিতে ছুটিতে গাহিতে লাগিলাম।

আয় বৃষ্টি হেনে,
(মাছের) মুড়ো দেব কিনে।

কেহবা হয়ত উল্টা গাহিল,

কচুর পাতায় করমচা
যা বৃষ্টি থেমে যা।

কিন্তু জয় আমাদেরই হইল। মুষল ধারে বৃষ্টি নামিল। কয়েকদিন খরার পরে তপ্ত বসুধাকে স্নেহালিঙ্গনে ভুলাইতে বৃষ্টি নামিয়াছিল। তাহার যে আকুলতা আমাদিগকেও মাতাইয়া তুলিল। মহানন্দে বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিলাম।

বর্ষার সেই উদ্দাম রূপের কথা আজও যেন মনে পড়ে। চারি পাশের শ্যামল তরু-শ্রেণী নত মস্তকে বৃষ্টিধারার আলিঙ্গন লাভ করিতেছে। ভীমশব্দে আকাশ পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে বজ্রের কড় কড় ধ্বনি। কিন্তু প্রকৃতির এই ভয়াঙ্কর মূর্ত্তিতে আমরা ভয় পাই নাই। আমরা উল্লাসে নাচিতে নাচিতে বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিলাম।

কিন্তু এ আনন্দ বেশীক্ষণ চলিতে পারিল না। মাতা সন্তানের জন্য ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরমাকে খোঁজে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের দুষ্টামির

প্রতিফল বৃদ্ধাকে ভোগ করিতে হইল। স্নেহার্দ্রস্বরে আসিয়া বুড়ী ডাকিলেন, "অজু, লক্ষ্মী দাদা আমার, ঘরে চল।" ফিরিতে মন সরে না। তাই আদেশ পালন করিতে চাই না, উপেক্ষাও করিতে পারি না। দ্বিধাশঙ্কিতভাবে বলি, "এই যাই ঠাকুমা!"

"না দাদা, বাজ পড়বে পরে ; মা শেষে বকবেন।"

মায়ের দুইরূপ—করুণ-কোমল আবার রুদ্র-ভীষণা। মাঝে মাঝে সেই কঠোর মূর্ত্তির পরিচয় পাইয়াছি। তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া ঠাকুরমার স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় লইলাম। মা দেখিলে ভৎর্সনা করিয়াই পালা শেষ হইবে না, একথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাই বাড়ীতে পা দিয়াই লুকাইয়া পরণের কাপড় খুঁজিয়া, গা হাত মুছিয়া সাধু সাজিয়া ঠাকুরমার শয়ন-কক্ষে জুটিয়া গেলাম।

রণজিৎ কাকার ছেলে, আমারই সমবয়সী। সে ঠাকুরমাকে বলিল, "একটা গল্প বল না ঠাকুরমা।" আমিও বলিলাম, "বল ঠাকুমা।" বুড়ী বলিলেন, "আচ্ছা বলছি! কিন্তু আগে শোও।" তারপর বালিস বিছাইয়া কাঁথা গায় দিয়া দিলেন। কাঁথার কথায় ঠাকুরমার রূপদক্ষ নিপুণ হস্তের কথা মনে পড়ে।

ঠাকুরমাদের যুগে এখনকার বিচিত্র সূচী-শিল্প চলন ছিল না। অপ্রয়োজনীয় ফুল, লতা, চিত্র আঁকিয়া অর্থ ও সময়ের অপব্যবহার তাঁহারা করিতেন না। বর্ত্তমানের মেয়েরা হয়ত বলিবেন, "প্রাচীনাদের রসবোধ ছিল না।" একথা আর যে কেহ মানুক আমি মানিতে পারি না। আমার শৈশবের স্মৃতির কথা যখনই মনে জাগে, তখনই ঠাকুরমার কলা-বিচিত্র কাঁথার ছবির কথা মনে পড়ে। পাড়ের সুতা দিয়া শত শতদলে সেই কাঁথা সুসজ্জিত।

অন্ন-কাঙাল হইয়া বিদেশের কোলে ঘুরিতে হইয়াছে বলিয়া সেই স্নেহ-যাদু-মাখানো জিনিষগুলি সযত্নে রক্ষিত হয় নাই। তাইত আজ দুঃখের নিঃশ্বাস অঝোরে ঝরিয়া পড়ে।

ঠাকুরমার গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত। কাঞ্চনমালা, মধুমালা, সখী-সেনা, সুতার-ময়ূর প্রভৃতি কত যে সুর-ভরা, রূপ-ভরা, রস-ভরা গল্প শুনিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বুড়ী গল্প আরম্ভ করিলেন, "এক অরুণ জঙ্গল—তার মাঝে এক বিশাল অশথ গাছ— সেই অশথ গাছে থাকে এক সত্যিকালের ব্যাঙ্গম আর ব্যাঙ্গমী।

আমি তখন বুঝিতে শিখিযাছি। তাই বুড়ির কথায় বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, "ব্যাঙ্গম কি ঠাকুরমা?"

বড় হইয়া জানিয়াছি বিহঙ্গমের অপভ্রংশ ব্যাঙ্গম। আমার ঠাকুরমা বুদ্ধিমতী ও চতুরা ছিলেন, তিনি অর্থ জানিতেন কিনা জানি না। কিন্তু অর্থ না বলিয়া বলিলেন, "অমন করলে গল্প বলব না বলছি।" সে কথা ঠিক, রূপ-কথার রাজ্যে সবই স্পষ্ট ও পরিচিত হইয়া গেলে, আনন্দ মিলে না। রূপকথা যে মায়ালোক সৃজন করে, তাহার জন্য চাই আধ-বলা আধ-বোঝা, আধ-জানা জিনিষ। কিন্তু সে তর্ক না করিয়া বুড়ী বলিলেন, "কাল থেকে অজুকে আর গল্প বলছি না, কাল হাসি আসবে; তাকে আর রণজিৎকে গল্প বলব।"

"আচ্ছা চুপ করছি, কিন্তু হাসি কে ঠাকুরমা?"

"হাসি তোর ছোটপিসীর বড় মেয়ে, সে খুব লক্ষ্মী।"

ছোট পিসীমাকে ইতিপূর্ব্বে দেখিলেও মনে ছিল না। হাসিকেও দেখি নাই। ঠাকুরমা গল্প বলিয়া চলিলেন। কিন্তু আমার মন গল্পের

রাক্ষসপুরীর বিপন্না রাজকন্যার প্রতি সহানুভূতি শূন্য হইয়া আগন্তুক পিসীমা ও পিসতুতো বোনের চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিল।

আমি কল্পনায় পিসীমার ও হাসির রূপ গড়িয়া তুলিতে লাগিলাম। গল্পের রাজপুত্তুর তখন ব্যাঙমের উপদেশ মত, ক্ষীর-সায়রের অতল জলে সোনার কৌটায় রাক্ষসের প্রাণ আনিতে ডুবিতেছেন। আমার তন্দ্রাতুর চোখে ক্ষীর-সায়রের নিতল কালো জল, আর নদীর জলে হাসি ও পিসীমার নৌকা, পিসীমা আনীত কর্পূর সুবাসিত খৈয়ের মোয়া তাল পাকাইয়া বসে। হিজিবিজি আবছায়ার মাঝে কখন যে ঘুমাইয়া পড়ি জানি না।

বুড়ী খানিক পরে ডাকেন, "অজু, শুনছিস না।"

স্বপ্ন-লোকের অচৈতন্য জগৎ হইতে মিথ্যা সাড়া দেই, 'হুঁ।"

ভোরের রোদের আলো আমাদের উঠানের ডাঁটা বনে হীরা পান্নার হাট বসাইয়াছে। চোখ মেলিয়া বাহির হইয়া শুনি, কে হাঁকিয়া বলিতেছে, "বুধির বাছুর ডাঁটা খেয়ে ফেল্লে।"

আমি ছুটিয়া গেলাম। চাকরে আসিয়া যে বুধির বাছুরকে মারিবে এ আমি সহিতে পারি না। তাহার অবশ্য ইতিহাস আছে। বুধি গাই দিনে তিন চারি সের দুধ দিত, তাহার অধিকাংশই আমার পেটে যাইত। তাই বুধি গাইয়ের বাছুরের উপর আমার মায়া জন্মিয়াছিল। বাছুরটিও বড় হইয়াছে, শীঘ্রই সে গরু হইয়া দুগ্ধদানরূপ পুণ্যব্রতে নিযুক্ত হইবে।

আমি তাহার নাম রাখিয়াছিলাম, "ভগবতী।" কিছু দুর্ব্বাঘাস ছিঁড়িয়া ডাকিলাম, "আয় ভগবতী।" আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ডাঁটার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া ভগবতী পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিল।

তাহাকে ভুলাইয়া জাবঘরে লইয়া চলিলাম। তাহার পর নিকটস্থ আম গাছ হইতে কচি পল্লব পাড়িয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলাম।

রণজিৎ আসিয়া ডাকিয়া বলিল, "দাদা দৌড়ে এস, হাসি এসেছে।"

হাসিকে রণজিৎ আগে দেখিয়াছে, ইহাতে আমার সমস্ত মন বিরূপ হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে যাহার আগমন কল্পনা করিয়াছি, সেই হাসিকে রণজিৎ দেখিয়া ফেলিল, ইহাতে আমার রাগের সীমা রহিল না। আমি রণজিতের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমের ডালেই বসিয়া রহিলাম। নীচে ভগবতী আমার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে কিন্তু তাহার মূক আবেদন বিফলে গেল।

খানিক পরে পিসীমা আসিয়া ডাকিলেন, "কি বাবা! গাছে রয়েছ কেন, এস।"

"না, আমি নামব না।"

"সে কি, তাহলে আমি চ'লে যাই। বাবা যদি রাগ করে, তাহলে কার কাছে থাকব?"

ইতিমধ্যে হাসি আসিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ডাকিল, "বা! অজিত দাদা কেমন বানর হয়েছে।"

হাসির এ কথায় অপ্রতিভ হইয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিলাম।

দুদিনেই হাসির মন জয় করিয়া লইলাম। হাসি অজিত দাদার কথায় ওঠে বসে। কিন্তু হাসিকে আমার বাহাদুরি দেখাইতে হইবে, তাহা না হইলে কখন সে রণজিতের সাথী হইয়া পড়িবে। কিন্তু যাহা ভয় করা যায়, তাহাই হয়। রণজিতের একটা বড় পুতুল ছিল, হাসিকে তাহা দিয়া সে হাসিকে আপনার সাথী করিয়া লইল।

কি করিব ভাবিয়া পাই না। পরাজয়ের ক্ষোভে ও গ্লানিতে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যায়। ছোট বয়সে সাথী ভাঙ্গিয়া গেলে যে কি গভীর মনস্তাপ পাইতে হয়, কেবল ছোট যারা তাহারাই বুঝিতে পারে কিন্তু বলিতে পারে না।

হাসিকে আমার খাবারের বেশী অংশ দিতে চাহিলাম, আমার খেলনা দিতে চাহিলাম, কিন্তু হাসি ভুলেনা, হাসিয়া পলাইয়া যায়।

সারা রাত্রি ভাবিয়া এক উপায় ঠাহর করিলাম। পরদিন পাশের বাড়ীর সুধীর ও হেনাকে ডাকিয়া আনিলাম। পিসীমা যে মিষ্ট মোয়া আনিয়াছিলেন, তাহার দুইটী দিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইলাম। কিছু দিন পূর্ব্বে রাজমিস্ত্রীরা আমাদের বাড়ীতে একটী দেওয়াল গাঁথিয়াছিল, তাহা দেখিয়া রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখিয়াছিলাম।

ঠাকুরমার একটী তুলসী মঞ্চ ছিল। প্রতিদিন তুলসীকে স্নান না করাইয়া বুড়ীর অন্নাহার হইত না। হিন্দুর অতি আদরের ধন তুলসী, কত যুগযুগান্তরের কল্পনা, ইতিহাস ও কাহিনী, তুলসী তরুর মাঝে মিশানো। ঠাকুরমাকে যাইয়া বলিলাম, "ঠাকুমা! দেখ তোমার মঞ্চের পাশে নতুন তুলসী-মঞ্চ গাঁথব—"

বুড়ী হাসিয়া বলেন, "বেশ।"

অনুমতি লইয়া মহোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। বাড়ীর সর্ব্বস্থান হইতে ইট যোগাড করা হইল। সুরকী চূণের মসলা তৈরী করা দুরূহ ভাবিয়া কাদা দিয়া গাঁথিব স্থির করিলাম।

সুধীর ও হেনা হইল যোগাড়ে, আর আমি হইলাম রাজ। বাড়ীতে পরিত্যক্ত একটী কর্ণি ছিল, তাহা লইয়া কাজ করিতে

বসিলাম। এক ভঙ্গীতে ইট সাজাই, মনোনীত হয় না, আবার নূতন করিয়া করি। মাঝের ফাঁক সারিতে ইট ভাঙ্গিতে হয়।

রণজিত দৌড়াইয়া আসে বলে, "দাদা, আমি কাদা করব।" অবজ্ঞায় প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে চাই। অবহেলা করিয়া বলি, "পালাও।"

হাসি আসিয়া বলে, "অজিত দা, আমায় কাজে নাও।" বেচারী জানে না তাহাকে কাজে আনিবার জন্যই এই আয়োজন, কিন্তু অত সহজে নমিত হইলে চলে না।

তাই রাগে ও অভিমানে বলি, "যাও, তুমি রণজিতের সঙ্গে পুতুল খেলগে, আমার কাছে কেন?"

হাসি যায় না, অভিমান করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আজ পরিণত বয়সের স্মৃতি ফিরাইয়া, হাসির সেই ভঙ্গিমা অনুভব করিতে চেষ্টা করি। হাসি বোনটীর তপ্তকাঞ্চনের মত রঙ, মাথায় এক রাশ ঝাঁকড়া চুল,—মোমের পুতুলটি যেন দাঁড়াইয়া আছে। সেই হাসি কালো মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছল ছল করিয়া চাহিয়া থাকে।

তাহার বিষাদভরা মুখের দিকে না চাহিয়া কাজ করিয়া যাই, মঞ্চ গাঁথিয়া ওঠে। হাসিকে শোনাইয়া শোনাইয়া গল্প করি। আমার নিজের একটী ফুল বাগান ছিল। ফুলকে আমি জীবনে গভীর ভাবে ভালবাসি। ফলের চেয়ে ফুলের প্রতি অনুরাগ জীবনে সার্থকতা আনে নাই, তাই কল্পনাবিলাসী আমাকে প্রিয় পরিজনেরা গালি দিবার সুযোগ পাইলে ছাড়েন না। কিন্তু কি করি ফুলের দেবতা হয়ত শৈশবের কোমল অন্তরে আপন প্রীতির রেখা চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমার সেই ফুলবাগানে একটী মোরগ ফুলের চারা আপনা হইতে হইয়াছিল।

কিন্তু তখন তাহাকে চিনিতাম না, কল্পনায় এই ফুলগাছের অসম্ভব পরিণতি মনে করিয়া লইতাম। হাসিকে ভুলাইবার জন্য সেই কল্পনায় পুনরায় রঙ দিয়া বর্ণনা করিয়া চলিলাম।

"জানিস হেনা, ঐ যে ফুলবাগানে নূতন চারা দেখছিস, ওর মাহাত্ম্য জানিস?"

হেনা জানে না,—বিস্ময়ে বলে, "কি বলনা দাদামণি!" আমি ঠোঁট ফুলাইয়া কথকের মত গম্ভীর মুখে বলিয়া যাই, "জানিস, এই যে মঞ্চ গড়ছি, এর উপর ওটা লাগাব। ও যে-সে গাছ নয়, ওর ডালপালাগুলি সোনার মত দেখতে হবে—প্রত্যেক ডালে ডালে একটা ক'রে মধুর বাটীর মত ফুল ফুটবে—পদ্ম ফুল ত দেখেছিস? তার কোরকের মত হবে।"

হেনা ও স্বধীর সমস্বরে বলে, "তাই নাকি দাদা!"

চাহিয়া দেখি হাসির হাসি-ভরা মুখ কালো হইয়া গেছে। মনকে জোর করিয়া শক্ত করিয়া কল্পনার ঘোড়া ছুটাই;—"সত্যি নয়ত মিথ্যা বলছি বুঝি! মৌমাছির ঝাঁক আসবে, সেজন্যে চার পাশে খুঁটা লাগিয়ে লাগিয়ে জাল টানাতে হবে, মধুর পেয়ালা দিন দিন বাড়বে, তখন সজারুর পাখনার শলা দিয়ে ছাড়িয়ে দিলেই মধু ঝরবে টুপ্ টুপ্ টুপ্..."হাসি এই কল্পনার উধাও বন্যায় আত্মহারা হইয়া ওঠে। কাঁদ-কাঁদ মুখে বলে, "অজিত দাদা, তোমার পায়ে পড়ছি।" বিজয়ী বীরের উল্লাসে হৃদয় নাচিয়া ওঠে। রণজিৎ আসিয়া ডাকে "চল্ হাসি, খেলা করি গে।" হাসি যায় না অধীর আনন্দে ব্যগ্রতায় উতলা হইয়া উঠে।

কিন্তু তথাপি শাস্তি না দিলে চলে না। মান বজায় রাখিতে হইবে। তাই হৃদয়ের কোমলতাকে কঠোরতার আবরণে ঢাকিয়া ফেলি। পরুষ কণ্ঠে বলি, "কেমন! কাল যে ডেকেছিলাম, তখন ত আসিস্‌নি, তোর কথায় বিশ্বাস কি!

"আচ্ছা, কি করলে তোমার বিশ্বাস হয়;"

কি বলি ভাবিয়া পাই না। অঙ্গীকার করাইবার বহুবিধ উপায় থাকিতে পারে, কিন্তু মনে তখন একটীও জাগিতে ছিল না। খানিক ভাবিয়া গম্ভীর মুখে বলিলাম, "বেশ, দক্ষিণ মুখো হয়ে নিশ্বাস নিয়ে, উত্তর দিকে চেয়ে বল্,—"হিমালয় সাক্ষী।"

হাসি অবিলম্বে আমার আদেশ পালন করিয়া আকুলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "আমায় মধু খেতে দেবে ত?" সেই প্রশ্ন চকিত করিয়া তুলে।

মনকে ভুলাইয়া রাখি। জোর করিয়া ভাবি, যাহা কল্পনা তাহা সত্য হইবে। সেই জোরে বলি, "দেব বই কি।"

ঝগড়া মিটিয়া যায়। হাসির সাথে ভাব হয়।

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার সে কি অভিনব আয়োজন। হাসি বলিল, "দাদা, সবাইকে নেমন্তন্ন কর।" আমি অসম্মত নই, বাজার হইতে বাতাসা কিনিয়া হরির লুট দেই। সবাই মিলিয়া কীর্ত্তন গান করিয়া মঞ্চের আবহাওয়াকে পবিত্র ও মধুর করিয়া তুলি, শিকড় শুদ্ধ মোরগ-ফুলের চারাকে আমার স্বহস্তে-নির্ম্মিত মঞ্চে স্থাপন করা হইল।

সে কি গভীর আনন্দ—অব্যক্ত ও অসীম। সৃষ্টির মাঝে যে অপূর্ব্ব অলৌকিক চাতুরী আছে, তাহা হৃদয়ে গভীর আনন্দামৃত

জাগাইয়া তুলে। সেদিনের বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠার কাহিনী তাই হাজার ভুলে যাওয়া কাহিনীর মাঝ হইতে মনের মাঝে আনাগোনা করিয়া যায়।

হাসি প্রতিদিন জল সেচন করিয়া মোরগ-ফুলের চারাটিকে বাঁচাইয়া তুলে। প্রতিদিন আমায় হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, "দাদা, মধুর বাটীগুলি কেমন হবে।" আমার কল্পনা শক্তি উর্ব্বর ছিল, কাজেই হাসির মনেও নূতন নূতন ছবি জাগিয়া ওঠে।

সন্থ রোপিত বৃক্ষে যেদিন রক্তবর্ণ কচিপাতা বাহির হইল সেদিন হাসির আনন্দ ধরে না। আমায় ডাকিয়া লইয়া দেখাইয়া নাচিতে লাগিল। মোরগ-ফুলের গাছে মধুর পেয়ালা হয় নাই একথা সত্য, কিন্তু হাসির কাছে এ বঞ্চনা ধরা পড়ে নাই। কারণ মাস খানেক পরেই পিসীমা আপন বাড়ী চলিয়া গেলেন।

যাওয়ার দিন সকালে রোদের আলোয় মোরগ-ফুলের গাছ হাসিতেছিল! তারই পাশে হাসি হাসিভরা মুখে দাঁড়াইল। তুলসী-মঞ্চকে প্রণাম করিয়া আমার নির্ম্মিত মঞ্চকেও সে প্রণাম করিল। তাহার পর আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "মধু হলে আমায় পাঠিয়ে দিও"

আমি বিশ্বাস-ভরা চিত্তে অম্লান বদনে বলিলাম—'দেব"।

কয়েক মাস পরে আমার সাধের কল্পনা সত্যের কঠোর আঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। তখন গভীর বেদনা পাই নাই, কারণ শিশুমন প্রতিনিয়তই বাড়িয়া চলে।—প্রতিদিন নব নব আনন্দ, নূতন গান, নূতন রূপ, নূতন রস শিশুর বর্দ্ধমান চিত্তের চারিপাশে ভিড় জমাইয়া তুলে।

কিন্তু গত দিবসের স্মৃতির পাতা নাড়িতে নাড়িতে আজ মন বিরস ও নিরানন্দ হইয়া উঠে। দুঃখনত চিত্তে পিছনের পানে তাকাই আর ভাবি—"কোথায় সেই স্বপন-পাখা-ভরা লঘু মন।"

হাসিকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম, একথা ঠিক কিনা জানি না, তবে আমার মন যে অপ্রাপ্য এক অজানার পানে ছুটিয়াছিল একথা নিছক খাঁটী সত্য।

— —0 ——

৪

জ্যোৎস্না সহস্রধারে বাতায়নের ফাঁকে আমার লেখার টেবিলে আসিয়া পড়িয়াছে। আলোর সমুদ্রে স্নান করিয়া মন যেন শুচিসুন্দর হইয়া দেখা দেয়। শৈশবের স্মৃতি জাগিয়া বসে।

শিশুকালের কথা মনে পড়িলে মনে হয় যেন হারান লেখার খাতা খুঁজিয়া পাইয়াছি। কতক বিস্ময়ে, কতক আনন্দে, পাতার পর পাতা সেই পুরাতন লেখার মাঝে পুরাতন আমাকে খুঁজিয়া পাইতেছি।

আজ দূরে বসিয়া গাঁয়ের পাঠশালার ছবি মনে পড়ে। ভৈরব নদ কলকল্লোলে বহিয়া চলে. তাহার পাশে ধানের ক্ষেত, আমের বন ও জঙ্গল, তাহা ছাড়াইয়া পথ। সেই পথ বাহিয়া গ্রামের হাটে যাওয়া যায়। "কদমার" লোভে ঠাকুরদাদার সঙ্গে হাটে যাই। হাট হইতে সওদা বহিয়া আনি, পুরস্কার একটি পয়সা মেলে। তাহারই আনন্দ ধরে কে? এক পয়সার আঠা মটকা কিনিয়া মনের আনন্দে বাড়ী ফিরি।

পথেই গাঁয়ের বটতলায় পাঠশালা। সেখানে ছেলের দল কোন দিন নামতা পড়ে—"চার কাকে এক কড়া, চার কড়ায় এক গণ্ডা—"। যুগপৎ সম্মিলিত স্বর বনপ্রান্তর ভেদ করিয়া যায়, চলিতে চলিতে পড়ুয়াদের আনন্দের কথা ভাবি। উহাদের দলে জুটিবার ইচ্ছা জাগে।

কোনও দিন বা ছেলেরা কিণ্ডারগার্ডেন পদ্ধতিতে বটতলায় দাঁড়াইয়া খেলা করে এবং গান করে। চাষীরা কেমন করিয়া চাষ করে, দাঁড়ীরা কেমন করিয়া দাঁড় বায়, তাহা লইয়া গান রচনা করে।

শিশু মনে পুলক জাগে। ভাবি এই জীবনের আনন্দরস চাই! বায়না ধরিলাম, পাঠশালায় যাইব। সে বায়না সেদিন আনন্দ ও কৌতুকে

আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে যে কান্না জমা ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলে কি এমনই বায়না করি।

নূতন তালপাতা চিরিয়া পাতা হইল, ভাঙ্গা টিনের ল্যাম্প দিয়া দোয়াত হইল, কঞ্চির কলম, আর তালপাতার রচিত আসন চাটখোল আর পাতা জড়াইয়া খাড়ু তৈরী হইল। এই ঐশ্বর্য্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া, ঠাকুরমার কোলে চড়িয়া জয়যাত্রায় বাহির হইলাম।

স্মৃতির পথ বাহিয়া সমস্ত ইতিহাস ঠিক যেন মনে আসে না। অবচেতন মন সেইদিনের আলোছায়ার অনেক ঝিলিমিলি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে।

অপরিচিত শিশুদলের মাঝে আর ততোধিক অপরিচিত গুরু মহাশয়ের কাছে ছাড়িয়া দিয়া, ঠাকুরমা চলিয়া গেলেন। মন ছঁাৎ করিয়া উঠিল। অপরিচয় চিরদিন ভয় বহন করিয়া আনে। মায়ের স্নেহকোমল মুখের কথা মনে পড়ে, গৃহের সহস্র আহ্বান চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।

গুরু মহাশয় আসিয়া হাতে ধরাইয়া লিখিতে লাগিলেন। গুরু ও পড়ুয়া উভয়ে সমস্বরে পড়িতে লাগিলাম—A আজির ক, খ, গ,। পাঠক হয়ত অবাক হইয়া গিয়াছেন, এ আবার বলে কি! ভাবিতেছেন এ কোন্ অপূর্ব্ব দেশের কথা বলিতেছি। এখন চলে কিনা জানি না, আমরা যখন পাঠশালায় পড়ি, তখন পাঠশালায় আজির ক বর্ত্তমান ছিল, ইংরাজি 'এ' (A) অক্ষরের মত দেখিতে এই কিম্ভূত কিমাকার বর্ণটি কি অনেক দিন ধরিয়া তাহার হদিস পাই নাই।

আমাদের অঞ্চলে মাতামহীকে চলতি কথায় 'আজি' বলে, পশ্চিম বাংলায় বলে 'আয়ি'। আজিমার নামের সঙ্গে স্নেহ ও প্রীতি মাখানো,

তাই শিশুবয়সে ভাবিতাম, এ বোধ হয় সেই আজির ক, তারই স্নেহ ও প্রেমমধুর ক !

প্রত্নতত্ত্বের ধার ধারিনা, বিদ্যা নাই, তবু বড় হইয়া ভাবিয়াছি এই আজির ক হয়ত আদির ক। বড় হইয়া জানি সর্ব্বকার্য্যে প্রণব উচ্চারণ মঙ্গলজনক, A এই আজির ক, সেই প্রণবসূচক। শূদ্রের প্রণবাধিকার নাই, তাই এই কল্যাণতম মন্ত্র বিকৃত হইয়া আজির ক'য়ে পরিণত হইয়াছে।

গুরুমহাশয় একবার লেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি শুধু কঞ্চির কলম লইয়া 'হাঁড়ি কুড়ি' লিখিতে বসিলাম। অক্ষর বিন্যাসের আগে ইচ্ছামত কলম চালানো প্রয়োজন, তাই গোল গোল চৌকা চৌকা ঘরের মত যথেচ্ছাকৃত যে সব রেখাসমবায় করা হয় তাহাকেই 'হাঁড়ি কুড়ি' বলে; লিখিতে লিখিতে বেলা হইয়া উঠে।

খানিক পরে দেখি ঠাকুরমা নিতে আসিয়াছেন। অশান্ত নাতিকে দূর করিয়া দিয়া বুড়ীর হয়ত প্রাণ কাঁদিতেছিল। ঠাকুরমার কথা যত মনে পড়ে, মন তত পুলকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মায়ের চেয়ে দরদী এমন সোনার মানুষ আমার জীবনে চোখে পড়েনি। তাঁর সেই দিব্য প্রীতির কথা মনে পড়িলে যেন স্বর্গ হাতে পাই।

লোকে বলে—এ অন্ধ-মায়া। আমি বলি' হোক অন্ধমায়া, তবু জীবনের এই সোনার কাঠি। মায়া যে ভগবানের প্রকাশমান রূপ। মমতার মাঝেই ত ভগবান রূপ নিয়া জাগেন। মায়া আছে বলেই জগৎ; মায়ার খেলা যেখানে শেষ, সেইখানেই প্রলয়ের বাঁশী বাজে।

ঠাকুরমাকে দেখিয়া পাতা দোয়াত ফেলিয়া ঠাকুরমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। ঠাকুরমা কোলে লইয়া পাতা দোয়াত

গোছাইয়া লইয়া চলিলেন। ছোট বয়স হইতে আমি গাছ-পালা, আকাশ, আলো, বাতাস ভালবাসি। কিন্তু সেদিন আর কোন আহ্বানই ভাল লাগিতেছিল না। ঠাকুরমার বুকে মুখ লুকাইয়া নীরবে শান্ত হইয়া বসিয়া রহিলাম। যে স্নেহের সরসী হইতে দূরে গিয়াছিলাম, সমস্ত অঙ্গ দিয়া সেই ভালবাসাকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিলাম।

ঠাকুরমা বলিলেন "কিরে অজু!"

আমি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিলাম "আর পাঠশালায় যাব না।"

ঠাকুরমা প্রশ্ন করেন—"কেন রে?"

আমি কথা কহিনা, শুধু দৃঢ়তার সহিত তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরি। ঠাকুরমা হয়ত সব বুঝেন, তাই চুপ করিয়া পথ চলেন।

রাত্রে শুইয়া ঠাকুরমা শতনাম বলেন,

"দিন গেল মিছে কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে,
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দে"

তাঁহার ললিত আবৃত্তি মনে অপূর্ব্ব এক আনন্দরস জাগাইয়া তুলে। কথার অর্থ বোঝাই সব নহে। শুধু অর্থ জানিবার চেষ্টায় যে শিক্ষা আজ দেশে চলিতেছে, সে শিক্ষা মন্ত্র না হইয়া কেবল ভার হইয়া উঠিতেছে। ভক্তি-মধুর কণ্ঠে ঠাকুরমা যখন এই মধুর শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, তখন মন যেন অচিন অজানা রাজ্যে চলিয়া যাইত।

নিঃস্তব্ধ গৃহ। কোণে মৃৎ-প্রদীপে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে তাহার যতটুকু আলো তার চেয়ে বেশী ছায়া, বাতায়নের ফাঁকে বাহিরের

আকাশ ও তরুলতার সংহৃত ছবি কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া দেখা যায়। অন্ধকারের এই আবরণের মাঝে চিত্ত ব্যাকুল ও ভীত হইয়া ওঠে। সেই পরিবেশের মাঝে একটী বিকচমান শিশু বালিসে মাথা গুঁজিয়া ঠাকুরমার সুধাকণ্ঠ শুনিয়া যাইতেছে।

মনের ভিতর একটী আঘাত লাগে, চমক লাগে। ভাব দিয়া, কল্পনা দিয়া, একটা অস্পষ্ট ছবি গড়ি। মনে মনে যমুনার ছবি গড়িয়া তুলি। আমাদের গাঁয়ের নদীর সহিত কল্পনা মিশাইয়া তমালবননীলা যমুনার ছবি মনে করি; আর তাহার তটভূমে গোষ্ঠ ভুমির ছবি আঁকি। সেই বৃন্দাবনে শিখিপুচ্ছধারী কৃষ্ণের ছবি মনে পড়িয়া যায়।

ঠাকুরমা শ্লোক বলিয়া যান। আমি কল্পনার আবেশে পিছাইয়া পড়ি। মনে মনে ভক্তিনত চিত্তকে এক অদৃশ্য দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া দেই। কতক বা ভয়ে, কতক বা আনন্দে, সে এক অপূর্ব্ব, অনুপম অনুভূতি।

পরদিন আর পাঠশালায় যাই না। ভোরে উঠিয়া ফেন-ভাত খাইয়া আমাদের জ্ঞাতি-কাকাদের বাড়ীতে বদরী ফলসংগ্রহে যাই। চলিত কথায় বদরীকে 'বরই' বলে। বাতাস আসিয়া বদরীর শাখা প্রশাখায় মিলনস্পর্শ জানাইয়া যায়, চঞ্চল শাখার দোলায় পক্ক ফল মাটীতে আসিয়া পড়ে। মিলিত শিশুর দল কাড়াকাড়ি করিয়া তাহা কুড়াইয়া লই। যে পায় সে নিজেকে দিগ্বিজয়ী বীর মনে করে।

চেষ্টা ও আয়াসে প্রাপ্ত এই ফল-লাভের মাঝে যে আনন্দ তাহা অনভিজ্ঞ সহরের শিশুদের বুঝাইয়া বলা মুস্কিল। প্রকৃতির মাঝে

যে ঘাত-প্রতিঘাত তার আবেষ্টনের মাঝে আমরা গড়িয়া উঠিয়াছিলাম, তাইত বারে বারে এই পুরাতন দিনের স্মৃতির কথা অন্তরে মধুধারা লইয়া জাগিয়া ওঠে।

বদরী লাভের জন্য সে কি প্রার্থনা! দল বাঁধিয়া প্রার্থনা করি :—

"শিব ঠাকুরের বর
একটী বরই পড়।"

শিবঠাকুরের প্রসন্নতা হইত কিনা কে জানে! পাখীর পাখনার ঝাপটায় কিংবা বাতাসে একটা কুল মাটীতে পড়িত। আমরা সেই অলক্ষ্য দেবতার করুণার প্রকাশ মানিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতাম। শিবঠাকুরের বরে একটী কুল পড়িয়াছিল, আমি যেই সেটা তুলিয়া ধরিব, অমনি ও বাড়ীর মণিদাদা আসিয়া খপ করিয়া সে বরই কাড়িয়া লইলেন।

তাহা লইয়া যথেষ্ট বচসা হইল। মণিদাদা কুল ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি, পাঠশালে যাস্‌নি, পড়ুয়া ডেকে তোকে চ্যাংদোলা করে নিতে বলে দিচ্ছি"।

আমি ভয়ে ভয়ে বাড়ী ফিরিলাম। ঠাকুরমা ভগবতীর দুধ দুইতেছিলেন। শৈশবে মাতৃস্তনে দুধ ছিল না, এই ভগবতীর দুধই আমার জীবন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমি ভগবতীর গলা চুলকাইয়া দিতে লাগিলাম। ঠাকুরমাকে বলিলাম "ও বাড়ীর মণিদা আমায় ভয় দেখিয়েছে, ঠাকুমা, আমি আজ আর পাঠশালে যাব না।"

আমার আকুল মুখ দেখিয়া ঠাকুরমার দয়া হইল। তিনি বলিলেন "আচ্ছা, আজ না হয় না গেলি, কিন্তু কাল থেকে রোজ রোজ যেতে হবে।" আমি অনাগতের চেয়ে আগতের প্রতি যত্নবান্

হইলাম। ভবিষ্যৎকে স্বীকার করিয়া লইয়া বর্ত্তমানের বিপদ হইতে রক্ষা পাইলাম।

মণিদাদার প্রেরিত দূতেরা ফিরিয়া গেল। সেদিন আর চ্যাংদোলায় চড়িবার স্থবিধা হইল না। পরে একদিন এ মধুর আস্বাদ হইয়াছিল, সে কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের যুগের পাঠশালা শেষ হইতেছে। তাই সে পাঠশালার কথা একটু বলি। বনস্পতি অশ্বত্থছায়ে দোচালা লম্বা ঘর। গুরু মহাশয় এক পাশে একটা জলচৌকীতে বেত্র হস্তে বসেন। ইটের উপর তক্তা ফেলিয়া ফলকাসন তৈরী, তাহাতে পাঠশালার সর্দ্দার পড়ুয়ারা বসে। অন্য সকলে নিজেদের নেওয়া তালপত্রের আসনে, কিম্বা চটের আসনে বসিয়া পড়া করে। আমরা ৩০।৪০টী ছেলে ছিলাম। প্রথমে তালপাতায় হাঁড়ি-কুড়ি লেখা হইত, হাঁড়ি-কুড়ির পর ক, খ, অ, আ, লিখিতাম। তাহার পর ঙ্ক, ঙ্খ, শিখি, তাহার পর স্ক, স্থ, রূপ যুক্তবর্ণের সমাহার শিখি। এইরূপে কড়া, বুড়ি, গণ্ডা পণ, সের শিখিয়া এবং 'সেবক' লিখিয়া পাতা লেখার পালা সমাপন হয়, তখন কলাপাতায় 'চিল্‌তে' ধরানো হইত। চিল্‌তে লিখিয়া অবশেষে কাগজ ধরিয়াছিলাম। কাগজের বাজার এখন সস্তা, তখন ছিল না। কাজেই এই দুষ্প্রাপ্যকে আমরা অবহেলা ও উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। কাগজ ধরিলে পণ্ডিতমহাশয় মানসাঙ্ক, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি শিখাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া, মদনমোহন তর্কলঙ্কারের পুস্তক শিশুপাঠ ও তাহার পরে কথামালা ইত্যাদি পড়িয়াছিলাম।

পাঠশালায় শাসনের বহর, পঠনের চেয়ে বেশী ছিল। দোষ করিলে নানাবিধ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। বেত্রদণ্ড নিত্য-নৈমিত্তিক ছিল, বিশেষত্ব বিশেষ কিছু ছিলনা। পাঠশালা হইতে পলাইলে সর্দ্দার পড়ুয়ারা যাইয়া পলাতককে গ্রেপ্তার করিয়া আনিত। তাহার পর তাহাকে ঘরের আড়ায় ঝুলিতে হইত। আর এক শাস্তি ছিল ঘুঘুমোড়া। ঘুঘুপাখী কেমন করিয়া মোড় খায় জানি না, ঘুঘুমোড়ার সহিত ঘুঘুর অঙ্গভঙ্গীর কোনও সাদৃশ্য আছে কিনা জানিনা। তবে ব্যাপারটী ছিল এই-আসামীকে মাটীতে চিৎ হইয়া শুইয়া পায়ের ভিতর দিয়া হাত ঘুরাইয়া কান ধরিয়া পাছা উঁচু করিয়া থাকিতে হইত। আর সেই উঁচু পাছায় মধ্যে মধ্যে বেতের কোমলস্পর্শ লাগিত। ইহা ছাড়া জল বিছুটি, হাতে ইট, কানমলা, নাকেখত প্রভৃতি বিচিত্র শাস্তি ছিল।

আজ অবাক্ হইয়া ভাবি, এই সমস্ত গুরু শাসনের ফাঁক দিয়াও কেমন করিয়া মা সরস্বতীর কমলাসনের জন্য সাধনা করিতে পারিয়াছিলাম। মানুষ সর্ব্বংসহ জাতি। সমস্ত অবিচারের মাঝে সে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। আমার এক বুড়ী দিদি বলিতেন,

শরীরের নাম মহাশয়,
যা সহাও তাই সয়।

তাই বোধ হয় এই কড়া শাসন সহিয়াও বিদ্যার প্রতি প্রীতি কমে নাই।

পাঠশালায় গিয়া কিছু পুরাতন হইয়াছি। পড়ার আগ্রহ যথেষ্ট ছিল। সপ্তাহে সিধা লইবার সময় শুভাকাঙ্খিনী পিতামহীর মনে

তৃপ্তি ও উল্লাস জাগাইবার জন্য গুরুমহাশয় বলিতেন "তোমার অজিত খুব বুদ্ধিমান ছেলে, কালে ও খুব বড় হবে।"

পণ্ডিত মহাশয়ের ভবিষ্যৎ-বাণী হয়ত সফল হয় নাই! নাই বা হইল, সংসারে শুভকামনা দুর্লভ, সেই শুভকামনা তিনি করিতেন তাইত তাহার আশীর্ব্বাদ বিফল নয়। ঠাকুরমা সিধা দিয়া বলিতেন, "দেখবেন ঠাকুর মহাশয়, ওকে বেশী মারবেন না! ও বড় আদুরে—" পণ্ডিত মহাশয় নীরব থাকিতেন। আমাদের দেশ নিষ্কাম কর্ম্মের দেশ, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে লাভালাভে সমান দৃষ্টি করিয়া কাজ করিবে, পণ্ডিত মহাশয় গীতা পড়িতেন কিনা জানি না, তবে তিনি পিতামহীর এই স্নেহানুরোধ না মানিয়া কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় অবিচল ছিলেন।

শ্রাবণ মাসের বর্ষা। ঝুপ্ ঝপ্ করিয়া জল ঝরিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, কালো মেঘের বাসর বসিয়াছে। ব্যাঙেরা জগঝম্প বাজাইতেছে। মন আর পাঠশালায় যায় না। বাগানে একটী ক্যাপল গাছে ক্যাপল ফল ফলিয়াছে। অম্ল-মধুর ক্যাপলের আস্বাদ আজ হয়ত বিরাগজনক, কিন্তু কর্দ্দম-পিচ্ছিল বাগানের মাঝে গাছে উঠিয়া নিঃসাড়ে ক্যাপল ভক্ষণের মাঝে একটা মাদকতা ছিল।

বর্ষার স্নেহালিঙ্গনকে একান্তভাবে চাহিয়া ক্যাপল গাছে বসিয়া বসিয়া সুরে গাহিতেছিলাম।

"বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর, নদী এল বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিনটী কন্যা দান
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, অপর কন্যে খান,
আর কন্যে খেতে না পেয়ে, বাপের বাড়ী যান।"

এ ছড়ার যে গভীর অর্থ তাহা আজিও জানি না। কিন্তু সেই বর্ষা-ভেজা কাননে শ্যামল তরুলতার মাঝে, আকাশের কালো মেঘের বুকে যখন বিজলী খেলিতেছিল, তখন মনে হইতেছিল শিবঠাকুর ধরণীতে নামিতেছেন। শিবঠাকুরের নামাতে বেশী বাধা ছিল না, কিন্তু কোথায় তাঁহার বধূ তাই লইয়া মহা ভাবনায় পড়িতাম।

আমারই পরিচিত ছোট ছোট মেয়েদের মাঝে শিবঠাকুরের বধূর তল্লাস করিতাম। বাড়ীতে পিতৃপুরুষের আরব্ধ দুর্গাপূজা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু দশপ্রহরণ-ধারিণী ভগবতীকে কিছুতেই বিয়ের কনে বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না; বিয়ের কনে ছোট হইবে, তাহার মুখে লজ্জার সঙ্কোচ থাকিবে, বিপদের আশঙ্কা ও চকিত চমক থাকিবে। অসুরদলনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী মা দুর্গা কখনও শিব-ঠাকুরের কনে হতে পারে না।

শিবঠাকুরের এই তিন কন্যে খুঁজিবার ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িতাম। শিউলির হাস্যচপল মুখখানি মনে পড়িত। ভাবিতাম শিউলি ঠিক শিবঠাকুরের কনে হইতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই এ দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিতাম। শিবঠাকুরের যে ভয়ানক শরীর, নিশ্চয়ই শিউলি তাহাকে বিয়ে করিবে না। ত্রিশূল দেখিয়া শিউলি নিশ্চয়ই ভয় পাইবে।

পরিত্রাণের নিঃশাস ছাড়িয়া অন্য কনে খুঁজিব, এমন সময় ক্যাপল-তলা হইতে কলরব ও আক্রোশ শোনা গেল। পাড়ার সর্দ্দার পড়ুয়া নকুল আসিয়া বলিল "এই নাম্‌ বলছি!"

"কেন?"

"পণ্ডিত ম'শায় তোকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন।" কি পরম পরিতৃপ্তির কথা! যে মাছ ধরে, তাহার কাছে তাহা পরম কৌতুক, কিন্তু যে মাছ মরে তাহার যে মৃত্যু, একথা আমরা সকল কাজেই ভুলিয়া যাই। একথা মনে থাকিলে সংসারে অত্যাচার ও বলদর্প চলে না, তাই সংসার অপরের দিকে না তাকাইয়া আপন শাসন অপ্রতিহত ভাবে চালায়।

কিন্তু সেই বয়সে নিজের শক্তির উপর অবিশ্বাসী ছিলাম না। শরীরে না থাকিলেও মনে মনে খুব জোর অনুভব করিতাম। শাসনের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করিবার জন্যই বলিলাম "যা রে যা, আজ আর পাঠশালায় যায় না।"

শিবঠাকুরের মাথায় যে সাপ থাকে, তাহারা যেমন গরুড় পাখীর ভ্রুকুটিকে ভয় করে না, বৃক্ষসমাসীন আমিও তেমনই নিজেকে দুর্গাশ্রিত মনে করিলাম।

কিন্তু আমার কল্পনার ফল ঠিকমত হইল না। আততায়ীরা আমাকে এত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা দুজনে গাছে চড়িল, আমি তাহাদের হাত এড়াইবার জন্য খানিকক্ষণ এ ডাল, সে ডাল করিলাম। পরে একটা নীচু ডালে গিয়া ঝুপ্ করিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা ছিল পলাইয়া যাই। কিন্তু নীচের প্রহরীরা আমাকে কিছুতেই ছাড়িল না।

ধরিয়া চ্যাংদোলা করিয়া আমাকে পাঠশালায় লইয়া চলিল। আমি মরিয়া হইয়া হাত পা ছুড়িতে লাগিলাম। কিন্তু পাঠশালার সৈন্যদল আমাকে সহজে নিষ্কৃতি দিতে চাহেনা।

বধ্যভূমিতে কে সহজে যাইতে চাহে? শাস্তির প্রখরতা অনুমান করিয়া আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম। পাঠশালায় নিয়া ফেলিতেই গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে আগাইয়া আসিলেন না, মিষ্টস্বরে বলিলেন "যাও, অজু দুষ্টামি করো না।" পণ্ডিতমহাশয়ের এই অসাধারণ কোমলতায় বিস্মিত হইয়া দৃষ্টি উন্নত করিয়া দেখি পণ্ডিত-মহাশয়ের পাশে চেয়ারে এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক উপবিষ্ট। পরে জানিয়াছিলাম তিনি পরিদর্শক। পরিদর্শককে ছেলেরা 'বাবু' বলিয়া ডাকিত। তাঁহার স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টি দেখিয়া অন্তর পুলকিত হয়। তিনি আমার আয়ত চক্ষু ও বিস্তৃত ললাটে কি দেখিয়াছিলেন কে জানে, আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "পাঠশালায় আসনি কেন, খোকা?"

পাঠশালায় এমন স্নেহ-মধুরতা থাকিতে পারে তাহা আমাদের জানা ছিল না। আনন্দগদ্গদচিত্তে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বলিলাম "আজ আমার আসতে ইচ্ছা করছিল না।" আমার দিকে পণ্ডিত মহাশয় ক্রূরদৃষ্টিতে চাহিলেন, পাঠশালার পড়ুয়ারা আমার অদৃষ্ট ভাবিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু আমার সত্য উত্তর পরিদর্শকের মনকে প্রীত করিল। তিনি আমায় আদর করিয়া বলিলেন "বাড়ী যেতে পারলে তুমি খুসী হ'বে?"

আমি বলিলাম "হাঁ।"

সকলে অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। আমার ধৃষ্টতায় তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু বক্তা স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন "আচ্ছা বেশ, তুমি আজ বাড়ী যাও, কাল পরশুও

তোমাদের ছুটী দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এর পরে আর স্কুল পালাবে না।”
আমি আনন্দবিহ্বল স্বরে উত্তর দিলাম “না।”

অনুমতি পাইয়া বিজয়গর্ব্বে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। এই স্নেহ-সম্ভাষণ আমার জীবনে যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল। তাহার পর আর পাঠশালা হইতে পলায়ন করি নাই। লেখাপড়ায় একটী পরম অনুরাগ জন্মিয়া গেল।

সংসারে মিষ্টকথার মূল্য আমরা বুঝি না। কথাকে তীব্র কি মধুর করা আমাদের ইচ্ছাধীন। অতি কঠোর কথাও বক্তার মিষ্টভাষিতার গুণে পরম প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। এই পরিদর্শকের নাম ধাম জানি না, কিন্তু তাঁহার স্নেহ বাক্যই যে আমায় মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, সে কথা আজ ভক্তিনত চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

ইহার পর পণ্ডিতমহাশয়েরও ব্যবহার বদল হইয়া গেল। তিনি আর কখনও আমাকে প্রহার করেন নাই। অন্যায় করিলে কেবল মুখের শাসনই করিয়াছেন। কড়া শাসনের পালা এমনই করিয়াই তাহার শেষ গাওয়া গাহিয়া গেল।

—— ০ ——

ভগবতীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মায়ের মত এই গাভীটি আমায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়াছিল। হারাণী এই ভগবতীর বাছুর—হারাইবার পূর্ব্বে তাহার কি নাম ছিল মনে নাই, কিন্তু হারাইবার পর হইতে আমরা তাহাকে হারাণী বলিয়া ডাকিতাম। লোমশ এই গোবৎসটী পাটল রঙের ছিল—সে আদর করিয়া আমার কাছ হইতে মর্ত্ত্যমান দয়া কলার খোসা খাইয়া যাইত। দড়ি ধরিয়া তাহাকে মাঠে লইয়া বাঁধিতাম।

আমাদের গাঁয়ে শীতের সময় গরুবাছুর মাঠে মাঠে চরিয়া বেড়াইত, বর্ষাকালে তাহাদের বাঁধিতে হইত। সেবার ফাল্গুনে একদিন সকল গরু মাঠ হইতে ফিরিল, কিন্তু হারাণী ফিরিল না। হারাণীর তখন ৩।৪ বৎসর বয়স হইয়াছে সে শীঘ্রই দুগ্ধবতী হইবে, তাই তাহার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল।

সন্ধ্যার সময় এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া দেখিয়া আসা হইল, কিন্তু হারাণীকে পাওয়া গেল না। ঠাকুরমা ব্যথিত ও দুঃখিত হইলেন। পুণ্যশীলা এই মহীয়সী নারীর কথা যত মনে পড়ে, মন ততই আর্দ্র ও নম্র হইয়া পড়ে। লেখাপড়া তিনি কিছুই জানিতেন না, অথচ কি কুশাগ্রবুদ্ধি, কি অপূর্ব্ব শালীনতা, কি অনুপম চরিত্র-লাবণ্য, কি বিরাট ধর্ম্মপ্রাণতা; হারাণীকে না পাইয়া ঠাকুরমা বড়ই কষ্ট অনুভব করিলেন। তাঁহার নিকট বাড়ীর প্রতি শিশুটি পরমাদরের ছিল। বাড়ীর একটী শিশু হারাইয়া গেলে তিনি যতটা কষ্ট অনুভব করিতেন, হারাণীর জন্য তিনি ততটা কষ্ট অনুভব করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় আর গল্প জমিল না। ঠাকুরমা আমাদের চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে বলিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া আমরা আর বিরক্ত করিতে সাহস করিলাম না।

আমার জাঠতুতো বোন নীতির সহিত আমি শ্লোক বলাবলি করিতে লাগিলাম। নীতি দিদি জ্যাঠামহাশয়ের সহিত বিদেশে থাকিত, কাজেই সে ঠাকুরমার মধুর সঙ্গ কম পাইয়াছে। তাই শ্লোক ও ছড়ায় সে আমার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। আমি তাহাকে হারাইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম, "বলত দিদি,

কাল ছাগলটার গলায় দড়ি
নিত্যি হাটে রাজার বাড়ী।

এটা কি ?"

ভাবিয়া চিন্তিয়া দিদি উত্তর খুঁজিয়া পায় না। রাজার বাড়ী ও কালো ছাগল লইয়া মনের মাঝে তোলপাড় করে। আমি অবশেষে হাসিতে হাসিতে বলি—"তেলের ভাঁড়।"

নীতি বলে—"কেন ?"

আমি বলি, "ছাগল কাল, ভাঁড়ও কাল, প্রত্যেক হাটেই তেল আনিতে হয়, তাই সে হাটে হাটে যায়।" বুঝিতে পারিয়া দিদি, হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

আমি বলি "আচ্ছা আর একটা বলব ?"

দিদির কৌতুহল জাগ্রত হয়, বলে "বল্‌না অজু !"

ছোট বয়সে ধীরে ধীরে অহমিকা জাগে। আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইলেই তাই মন খুসী হইয়া ওঠে। আমি গাম্ভীর্য্য আনিয়া উপদেষ্টার মত বলি, "বেশ, এইটা বল,

এখান থেকে মারলাম ছড়ি
ছড়ি গেল ভুবন-ডাঙ্গা।"

এ কূট প্রশ্নের অর্থ নীতির মাথায় খেলে না। নীতি আকাশ পাতাল বসিয়া ভাবে। স্তিমিত দীপালোকে আমি আপন জয়গর্ব্ব আপনা-আপনি অনুভব করি। নীতির মনে আঘাত লাগে, সে বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করে।

নভেল-পড়া মায়েরা এই সমস্ত ছড়া ও প্রশ্ন ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ পুলকিত চিত্তে শিশুবয়সের এই আনন্দানুভবের কথা স্মরণ করি। এই সমস্ত ছড়া মনের তারে মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিল। বিকচমান শিশু-হৃদয়ে একটা কি জানি কি ভাব জাগাইয়া তুলিত। পরিচিতের মাঝে একটা অপরিচয়ের যাদু আনিয়া হৃদয়ের পুষ্টি, মনের পরিসর বৃদ্ধি করিত। দেশে দেশে যুগে যুগে শিশুমন রূপকথা ভালবাসে তাহার কারণই এই। যাহা দেখি, যাহা শুনি সেই বস্তু-জগতই সংসারের সব নয়, দেখা ও শোনার পাছে এক মায়ালোক আছে, কল্পনার প্রস্ফূতির জন্য তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সারা ভুবন ভরিয়া যে-স্থলভূমি, যে ডাঙ্গা, তাহার উপর দিয়া যে ছড়ি চলিয়া গিয়াছে সে পথ। পরিচিত স্থান হইতে বাহির হইয়া অপরিচিত অরূপ লোকে বাহির হইয়াছে। দিদি কিছুতেই 'পথ' বলিতে পারিল না। কেবল স্তব্ধ বিস্মিত চিত্তে উত্তর শুনিল—'পথ ?' দিদির প্রশ্নে আমি কেমন করিয়া তাহাকে সবটুকু বুঝাইয়া দিলাম, তাহা

মনে পড়ে না, তবে কিছু হেঁয়ালি, কিছু রহস্য মাখাইয়া এক অপূর্ব্ব কিছু বলিয়াছিলাম, তাহাই মনে হয়।

পরদিন ভোরের ফাল্গুনের উদার আলো আসিয়া যখন বারান্দায় পড়িয়াছে, যখন মুকুলিত আম্রতরুর সৌরভে দিগন্ত সৌরভিত, তখন নীতি ও আমি বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। নীতি হিন্দুস্থানীদের দেশে থাকিয়া হিন্দুস্থানী গল্প ও ভাষা শিখিয়া আসিয়াছিল, তাহাই সে আমায় বলিতেছিল।

সে হিন্দুস্থানী কথার সমগ্র রস যে অনুভব করিতেছিলাম তাহা নয়, সমগ্র হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিলাম। রোদের সোণালি আলোয় সবুজ বনসীমা ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। উপরে আকাশের নীলায়তনের অসীম বিস্তার মনকে কাড়িয়া লয়। পায়ের তলে অঙ্গনের হরিৎ দূর্ব্বাদল গৃহশেষে কাননে মিশিয়া যায়। এই আবেষ্টনের মাঝে আমি ব্যগ্র ও আকুল হইয়া কেবল অনুভব করিতেছিলাম।

ছোটকাকা বলিলেন, "হারাণীকে খুঁজতে যাবিরে, অজিত ?"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া গল্পের মাধুর্য্য ভুলিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। চঞ্চল অধীরতায় বলিলাম "যাব।"

কাকার সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁশবনের তলায় পথ চলে —খানিক আগাইয়া গাঁয়ের পথ তেমাথায় মেশে, এক পথ উত্তরে কোন দূরে চলিয়া গিয়াছে, পশ্চিমের পথ মাঠে চলিয়া গিয়াছে। তেমাথায় বৃহৎ বট গাছ শাখা-প্রশাখায় বিপুল রাজপাট বিস্তার করিয়া শোভা পায়।

পশ্চিমের রাস্তায় চলিতে চলিতে নারিকেল ও তাল, আম ও কাঁঠালের বন ছাড়াইয়া সহসা মাঠে আসিয়া পড়ি। ধান-কাটা ক্ষেত

দিগন্ত পর্য্যন্ত ধূ ধূ করে, কর্ত্তিত তৃণের অবশিষ্টাংশ রহিয়াছে, বন্ধনমুক্ত গোপাল তাহা মহানন্দে ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও সেই ক্ষেতের মাঝে কলাইসুঁটী ছড়ান ছিল, চলিতে চলিতে কলাইসুঁটী তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিলাম।

কোথাও দূরে একটী লাল রঙের গাভি দেখা যায়। কাকা জিজ্ঞাসা করেন, "কিরে অজিত! ঐটা হারাণী নয়?"

আমি সোৎসাহে বলি "হাঁ, সেই রকম ত দেখায়।"
তখন মাঠ ভাঙিয়া তাহার কাছে যাই, কিন্তু পৌছিয়াই দেখি আমরা মায়ামৃগের পিছনে ছুটিয়াছি। এমন কতবার যে হয়রাণ হইলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই।

তখন মাঠ-চারী চাষীদের জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওগো, তোমরা একটা লাল বাছুর দেখেছ?"

উত্তরে অপ্রতুলতা নাই। সহরে যেমন মানুষ মানুষের সহজ সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া দূরে বসিয়া থাকে, পাড়াগাঁয় তাহা হইবার জো নাই, প্রত্যেকেই একটী প্রশ্ন শুনিয়া দশটী প্রশ্ন করে। ঠিকুজী, কুলজী ও ইতিহাস লইয়া আধ-ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়।

আজ জীবন-সংগ্রামে তাড়া বেশী। পথপ্রান্তে বসিয়া এইরূপ নিবিড় আলাপ জমাইবার সুযোগ নাই তাই কৌতূহলকে দমন করিয়া যে যার কাজে মন দেই কিন্তু মন তাহাতে তৃপ্ত নহে। চেষ্টা ও যত্ন জটিল হইতেছে, জীবনের মধুরতা ও শান্তি ততই ত দূর হইতেছে।

তোরাপ সেখ আমাদের বর্গাদার প্রজা। আবাদে আমাদের জমি চাষ করে বলিয়া সে আমাদিগকে খাতির করিল। তাহার বাড়ী লইয়া গিয়া আমাকে মুড়ি ও গুড় খাইতে দিল। আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ

খোঁজাখুজি করিল, অবশেষে বিফলমনোরথ হইয়া কাকাকে বলিল, "বাবু, ব্যস্ত হ'বা না, ও গরু তোমার সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ী যেয়ে হাজির হবেই।"

তাহার আশ্বাসবাণী একেবারে শূন্যগর্ভ নহে। কখনও কখনও গরু মাঠে চরিতে গিয়া অন্য সঙ্গে মিশিয়া অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, পরদিন আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসে।

চলিতে চলিতে পথে রেল লাইন বাধিল। কাকা তাহার উপর উঠিয়া দূরে চাহিয়া দেখিলেন। দূরে প্রান্তর ভূমির শেষে জলের রেখা দেখা যাইতেছিল, যেন দিগন্তের চক্রনেমিতে একখানি শুভ্র চাদর জড়াইয়া আছে। কাকা বলিলেন, 'ঐ ময়ূরাক্ষী নদী।'

এই সুন্দর অনুভূতি আমার নিকট আজিও জীবন্ত রহিয়াছে। কালের ও দেশের ব্যবধান ছাড়াইয়া আমি যেন সেই উচ্চ রেলপথের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছি—আর আমার সম্মুখে যেন চক্রবালের তটপ্রান্তে সেই জলরেখা শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে।

প্রকৃতির মাধুর্য্যের এই যে অনুপম অনুভব ইহার মধ্যে অশেষের উল্লাস আছে, তাই কখনও ইহার শেষ নাই। সুন্দর যখন হৃদয়ে দেখা দেয় তখন সমস্ত ফাঁককে পূর্ণ করিয়া পরম পূর্ণতায় দেখা দেয়, তাই আনন্দের যেমন অবধি থাকে না, বোধের তীব্রতার তেমনই শেষ হয় না।

জীবনে তাহার পর কত বর্ষা, কত শরৎ, কত বসন্ত, আপন আনন্দ নিয়া দেখা দিয়া চলিয়া গিয়াছে তবু এই দৃশ্য, এই ছবি অম্লান ভাতিতে মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। আয়োজন বেশী কিছু নয়, মনের পথে সৃষ্টি করিতে বেশী কষ্ট হয় না, নির্ম্মল নীলাকাশ অনন্ত সম্ভাবনায় উপরে

বর্ত্তমান, পদতলে শ্যামলা বসুমতী, বনরাজিনীল চক্রবালরেখা আর তাহার নীচে জলরেখা।

জীবনে যখনই ব্যথা পাইয়াছি, যখনই দুঃখে বিহ্বল হইয়াছি, তখনই শিরায় শিরায় এই আশ্চর্য্য অনুভূতির স্মরণে এক নূতন উত্তেজনা জাগিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে রেলগাড়ী চলিতে দেখি নাই। একটী রেলগাড়ী আসিতেছিল, কাকা আমাকে নিয়া দূরে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "রেলগাড়ী যাবে এখন, দেখ্‌বি।" আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। দুরন্ত বিক্রমে গাড়ী ছুটিয়া আসিল। এই প্রচণ্ড গতিটা আমার সমস্ত অন্তরকে বিস্ময়ে আবর্ত্তিত করিয়া তুলিল। গতির মাঝে একটা পরম আনন্দ আছে। আমাদের জীবন বেশীর ভাগই স্থিতিশীল, তাই যখন পাখীর আকাশ-গতি দেখি, যানের দ্রুতগতি দেখি তখন তেজের বিকাশ দেখিয়া পরম পুলকিত হই। এই কারণে বড় বয়সেও আমাদের মাঝে যে শিশুমন আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া বজায় থাকে, তারা জাগিয়া উঠিয়া বুড়া শিশুকেও চলমান গাড়ীর দিকে তাকাইয়া থাকিতে বাধ্য করে।

বেলা বাড়িতেছিল। ফাল্গুনের শীতমধুর প্রভাতী রৌদ্রের তেজ খরতর হইয়া উঠিতেছিল, কাজেই কাকা বলিলেন, "চল অজিত, ফেরা যাক্।"

আমিও বাড়ী ফিরিবার দুর্নিবার লালসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতে-ছিলাম। কাজেই তথাস্তু বলিয়া অনুসরণ করিলাম।

ফিরিবার সময় একটী মাঠের মাঝে একটী বন্য কুলগাছে বন্যকুল পাকিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, চ্যাঙা মারিয়া কুল পাড়িলাম। পাকাগুলি ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম, আর ডাঁশাগুলি নীতি দিদির জন্য বাড়ী লইয়া চলিলাম।

ঠাকুরমা হারাণীকে পাওয়া যায় নাই বলিয়া পরম দুঃখিত হইলেন। সেদিন আর পাঠশালায় যাইতে হইল না। নীতিদিদি ও আমি বাগানে নারিকেলের মালা লইয়া রান্না বাড়ী খেলা আরম্ভ করিলাম।

সন্ধ্যাকালে নীতি দিদি ও আমি বারান্দায় বসিয়া তারা দেখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রতি সন্ধ্যায় অন্তহীন সীমাহীন শূন্য পাথারে মণি-দীপের মত দীপ্তোজ্জ্বল এই যে সব নক্ষত্র ও তারকা দেখা দেয়, তাহাদের দেখিয়া চক্ষু আর তৃপ্ত হয় না। কত যে দেখিয়াছি তবুও আনন্দের শেষ নাই। নীতি দিদি প্রথমে একটী তারা বাহির করিয়া বলিল, "ঐ দেখ অজু, নারিকেল গাছের মাথায় একটা তারা ফুটেছে।"

আমি আগে দেখিতে না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। নীতিদিদিকে জব্দ করিবার জন্য বলিলাম—'এক তারা বামন মারা' অর্থাৎ এক তারা দেখিলে ব্রহ্ম হত্যার পাতক হয়।

নীতিদিদি অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহে। আমি বলি, "বেশ, পাঁচটী মুনির নাম কর।"

ব্যথিত স্বরে দিদি বলে, "আমিত কারও নাম জানিনে।" "ধেৎ, কারও নাম জান না?"

বিহ্বলতা ভুলিয়া দিদি আত্মস্থ হইয়া বলে—"এক ত নারদ মুনির কথা জানি।"

আমি উৎসাহিত করিবার জন্য বলি—"বেশ তারপর বশিষ্ঠ, ব্যাস" —নীতি দিদি বলে, "আর বিশ্বামিত্র।"

আমি সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলাম "বিশ্বামিত্রে চল্‌বে না, উনি যে আগে ক্ষত্রিয় ছিলেন, উনি ত আসল ব্রাহ্মণ নন।" বিশ্বামিত্র

বালকের কথায় কুপিত হইয়াছিলেন কিনা জানি না, নীতি দিদি বলিল, "তা হলে কি হয়, উনি ত তপস্যা করে সত্যই ব্রাহ্মণ হয়ে ছিলেন।"

আমি পুরুষ, চিরকাল নারীকে কথা শুনাইব, কথা শুনিব না এই ত আমার বীরত্ব। তাই নীতিদিদিকে ধমকাইয়া বলিলাম—"ওতে হবে না যা বল্‌ছি, শোন, বল নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ভৃগু আর কশ্যপ।' মন্ত্র পড়ার মত নীতি দিদি বলিল, "নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ভৃগু, কশ্যপ।" তখন ক্রমে ক্রমে তারা ফুটিতে লাগিল। আমি নীতিদিদিকে দক্ষিণে একটা দেখাইলাম, নীতি দিদি আমায় উত্তরে একটা দেখাইল।

সম্মুখের আকাশে তখন সাত ভাই কৃত্তিকারা উঠিয়া ছিল, আমি বলিলাম, "ঐ দেখ দিদি, সাত ভাই কৃত্তিকা।"

দিদি অপলক নেত্রে এই তারকা মণ্ডলীর উপর চাহিয়া রহিল পরে বলিল, "তুই সাত ভাই চম্পার গল্প জানিস ?"

আমি সহর্ষে বলিলাম, "জানি বই কি, ঐ যে শোলোক আছে—।

সাত ভাই চম্পা জাগরে
কেন বোন পারুল ডাকরে ?"

দিদি বলিল, "আমার হিন্দুস্থানী আয়ী একটা মজার শোলোক বলেছে, শুন্‌বি ?"

গল্প শুনিতে অকাতর। দিদি গল্প বলিয়া গেল। স্মৃতি সমুদ্র মন্থন করিয়া এই বিদেশী গল্প বাহির করিতে পারি নাই। সমস্তই হিজিবিজি হইয়া গিয়াছে। সাত রাজার ছেলে সাত ভাই চম্পা হইয়া ফুটিয়াছিল আর তাহাদের অনাদৃতা কনিষ্ঠা দুলালী রাজতনয়া পারুল হইয়া জাগিয়াছিল। সেই রাজার ছেলেরা পৃথিবীর লীলাশেষে তারা হইয়া জন্মিয়াছে, কিন্তু ছোট বোনটী পারুল কোথায় ?

বড় হইয়া জানিয়াছি মেষ ও বৃষ রাশির এই নক্ষত্র পুঞ্জ আসলে বহু সংখ্যক তারার মণ্ডলী। বহু তারার সমবায় বলিয়া গ্রীকেরা ইহাকে 'প্লিয়াডিস্' বলিত। দেব সেনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয়কে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম কৃত্তিকা।

এই জ্ঞান পাইয়া আনন্দ পাইয়াছি কি ছোট বয়সের সেই সাত ভাই চম্পার মূর্ত্তিধর কৃত্তিকাকে দেখিয়া আনন্দ পাইয়াছি বলা সুকঠিন নহে। নির্য্যাতিত রাজার ছেলেদের সহিত সহানুভূতিতে অন্তর পূর্ণ ছিল, তাই সেই রাজতনয়েরা দীপ্ত তারকা হইয়াছে জানিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাই, তাহার সহিত তুলনায় সত্য জ্ঞানও ব্যর্থ মনে হয়।

পরের দিন বিকালে আবার হারাণীর সন্ধানে চলিলাম: বাবা, কাকা ও আমি। হারাণীকে খুঁজিতে গিয়া আমি গ্রামকে চিনিয়াছিলাম। গাঁয়ের মাঠ, গাঁয়ের বাট, গাঁয়ের ক্ষেত, বন বাদাড়, গুল্ম, তরুলতা কত যে দেখিয়াছিলাম, কত যে চিনিয়াছিলাম, আজ ভাবী জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ভাবে বলা অতি কঠিন। পর জীবনের কিছু কিছু অনুভূতি হয়ত এই আনন্দপ্রদ অভিযানের সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

ঘরে বসিয়া বই পড়িয়া যাহা শিখি, তাহার অর্দ্ধেকই অজানা অশেখা হইয়া থাকে। বস্তুর সহিত মনের যেখানে সত্যকার যোগবন্ধন হয় নাই সেখানে পরিচয় পরিচয়ই নহে। ধানের ক্ষেত, সব্জীবন, আমবাগান, খড়ের মাঠ, পুকুর, কুপ, গাছ এই অভিযানে যাহা দেখিয়াছিলাম, সকলই একটী বিচিত্র সাড়ায় হৃদয় স্পন্দিত করিয়াছিল।

যখন কাজ থাকে না, মন শূন্য হইয়া পড়ে, তখন কল্পনানেত্রে সেই ছোট বয়সের বিচিত্র ভাববিলাস অনুভব করিতে চেষ্টা করি। সে

আকাশ, সে বাতাস, সে বনভূমি আর চোখে জাগিবে না জানি, তথাপি অনন্ত সময়কে ফাঁকি দিয়া তাহার গতিবেগকে বিবর্ত্তিত করিয়া যা'তে হারাণো দিনের সেই আনন্দক্ষণগুলিকে ফিরিয়া পাই তাহার জন্য মন মাঝে মাঝে চেষ্টা করে।

হারাণীর সন্ধানে এমন করিয়া দিনের পর দিন ঘুরিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিলাম। বাড়ীর সকলেই ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বিব্রত হইয়া বাবা বলিলেন, "না, হারাণীকে আর পাওয়া যাবে না, কাল থেকে আর মিছে মিছে ঘুরে কাজ নেই।"

ঠাকুরমা তখন সন্ধ্যাবেলায় দীপ দিতেছিলেন। তুলসী মঞ্চের নীচে প্রদীপ রাখিয়া তিনি আপন দেবতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "অমন কথা বলিস্‌নে, আমি জানি আমার হারাণী ফিরে আসবে।" আমি বারান্দায় বসিয়া খেলা করিতেছিলাম। ঠাকুরমার সেই উচ্চ কণ্ঠ আমার কানে গেল। এ বাণীর যে কি মূল্য তাহা আমি জীবনে কতবার কত মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়াছি। যখনই কোনও বিপদ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে তখনই এই ভক্তিমতী নারী এমনই আশ্বাস বাণী দিয়াছেন, আর প্রতিক্ষেত্রেই তাহা ফলিয়াছে।

বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা, এই পরম নির্ভরতা যে ধর্ম্মপরায়ণতায় সম্ভব সে বিশ্বাস দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাই এ দৃশ্য আর দেখিতে পাই না। আপদে বিপদে শোকে সন্তাপে তাঁহার অমৃত আশ্বাস যে মন্ত্র-শক্তির মত কাজ করিত, সে আশ্বাস আর কেহই দিতে পারে না। বড় হইয়া কত মানুষের সহিত মিলিয়াছি, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এই দৃঢ়তা, এই পরম গভীর আশ্বস্ততা আর কোথাও দেখি নাই।

হারাণীর পিছনে আর ঘুরিলাম না। ঠাকুরমা নিষেধ করিয়া দিলেন। মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা, ঐ কলসে যে দুধমৌ ধান আছে, ওটা খরচ করো না, হারাণী ফিরলে 'আশানারায়ণের' পূজার সিন্নি দিতে হবে।"

সেই অমোঘ বাক্য ফলিল! হারাণী ফিরিল। একদিন রাত্রে আমাদের পোষা কুকুর কালী ডাকিতে লাগিল। ঠাকুরমা বিছানা হইতে উঠিয়া চাকর পরেশকে ডাকিয়া বলিলেন—"পরেশ, হারাণী এসেছে, হারাণীকে বেঁধে রাখ।" হারাণীর অপ্রত্যাশিত আগমনে বাড়ীতে কলকোলাহল পড়িয়া গেল। আমরা সকলে উঠিয়া হারাণীকে দেখিতে চলিলাম। বাবা দেখিয়া বলিলেন, "হারাণীর একটা কান কেটে দিয়েছে, মা!" ঠাকুরমা কথা কহিলেন না।

আরমান আমাদের গাঁয়ের নামজাদা চোর। বড় বয়সে বুড়া আরমানের নিকট তাহার চুরির অত্যদ্ভুত বহু কাহিনী শুনিয়াছি। আরমান বলিত, সে মন্ত্রবলে দরজা খুলিতে পারে। কোনও দিন পরীক্ষা দিয়া সে আপন শক্তির পরিচয় দেয় নাই, তথাপি তাহার যে বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াছি, তাহাতে তাহার অত্যদ্ভুত শক্তিতে অবিশ্বাসী হইতে সাহসী হই নাই।

পরদিন অতি ভোরে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখি, আরমান ঠাকুরদাদার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে—"দোহাই দাদাঠাকুর, আমায় রক্ষা করুন।"

মা আমাদিগকে দরদালানে যাইতে বারণ করিয়া বলিলেন, "ওখানে খবরদার যাস্‌নে, ওখানে চোরের সর্দ্দার আরমান জমাদার এয়েছে।"

মায়ের বারণে ভয় হইল। কিন্তু এতদিন কেবল গল্পেই চোরের কথা শুনিয়াছি, আসল চোরকে দেখি নাই, তাই কৌতূহল নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইল। অন্য ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া আরমানকে দেখিতে লাগিলাম।

কল্পিত চোরের সহিত আরমানের আদবেই সাদৃশ্য ছিল না। তাহার আকৃতি বিরাট যমদূতের মত নহে। মাংসল পেশীবহুল পুষ্ট দেহ শক্তিমান বীরের মত। মুখে একটী পরম প্রশান্তি। তাহাকে দেখিয়া আমার ভয় হইল না। আমি ধীরে ধীরে দরদালানে উপস্থিত হইলাম।

ঠাকুরদাদা আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "তোর জন্যে এই দুধের ছেলে মাঠে হয়রাণ হয়ে ফিরেছে, তোকে কি করে ছেড়ে দেই?"

আরমান কথা কহিল না। তাহার বড় বড় চোখ দুটী দিয়া আমাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর আমাকে কোলে লইতে আহ্বান করিল।

অপরিচিতের এ আহ্বান আর বিশেষতঃ চোরের আহ্বান আমার মনঃপূত হইল না। আমি দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আরমান ও আর কয়েকজন মিলিয়া আমাদের গরু চুরি করিয়াছিল। কেন এবং কি মতলবে সে সব কথা ঠিক মনে নাই। চোরেদের মনান্তর হওয়ায় হারাণীকে তাহারা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই নিয়া নালিশ ফরিয়াদ করিয়া আরমানকে অপদস্থ না করি, এই জন্য সে অনুনয় করিতেছিল।

ঠাকুরমা কোথায় ছিলেন, তিনি আসিতেই আরমান সত্যই চোখের জল ফেলিল এবং করুণস্বরে বলিল "মা ঠাকরুণ, আমায় এবার মাপ করুন।"

ঠাকুরমার হৃদয় বজ্রের মত কঠোর আর কুসুমের মত কোমল ছিল। ঠাকুরদাদার মতের অপেক্ষা না করিয়া তিনি অনুতপ্ত আরমানকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু দৃপ্তস্বরে আমাকে সম্মুখে টানিয়া বলিলেন, "এই বালক নারায়ণের মত, এর পা ছুঁয়ে তুই বল যে আর কখনও এমন কাজ কর্‌বিনে, তা'হলে তোকে ছেড়ে দেব।"

আরমান দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল। বড় হইলে সে আমায় বলিয়াছিল যে সে আর কখনও চুরি করে নাই, কিন্তু সে কথা আমি বিশ্বাস করি নাই। ঠাকুরমা ঠাকুরদাদার দিকে চাহিয়া আদেশের মত বলিলেন, "ওকে ছেড়ে দাও।" বাবা ও কাকা জোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। এমন চোরকে কায়দায় পাইয়া ছাড়িয়া দিলে যে সমূহ সর্ব্বনাশ হইবে সে কথা বার বার বলিলেন। কিন্তু ঠাকুরমা অবিচলিতা রহিলেন।

আরমান মনের উল্লাসে ফিরিয়া গেল। সেই হইতে সে আর আমাদের অবাধ্যতা করে নাই, এবং কালেভদ্রে আনুগত্য স্বীকার করিয়া মহদুপকার সাধন করিয়াছে।

গৌরবময়ী পিতামহীর এই তেজোদীপ্তি আজিও আমার চোখে যেন ঝলসিত হইতেছে। কিন্তু যে বালকের মাঝে তিনি নারায়ণের প্রকাশ অনুভব করিতে চাহিয়াছিলেন, সংসারের ধূলিকাদায় সে মলিন হইয়া গিয়াছে।

অতীতের কথা যখন মনে পড়ে, তখন ভাবিতে বসি, হায়! যে দেবতাকে তুমি জাগাইতে চাহিয়াছিলে, সে কি কখনও আমার অন্তরে জাগিবে না? তৃষিত মরুর দাবদাহ লইয়া কি জীবন বহিয়া চলিবে? কে জানে কখন কি হয়? তাঁর সাধনা যে পিছনে রহিয়াছে তাই অন্ধকারের মধ্যেও কিছু কিছু জ্যোতিঃরেখা আজিও দেখিতে পাই।

———

৬

চৈত্রের নিঝুম দুপুর।

রৌদ্রের রুদ্রকর সমস্ত ভুবনকে দগ্ধ করিতেছে। মাঝে মাঝে কাকের কা কা রব শোনা যাইতেছে। চৈত্রের অলস মধ্যাহ্নে শিশুকালে বাগানে আম কুড়াইবার ধূম পড়িয়া যাইত। পাঠশালা হইতে ফিরিয়া ভাত খাইয়া আমতলায় যাই আর বিকাল বেলা ৩টায় ফিরি।

গাছে গাছে পাখীরা তখন কলরব করে। কোকিলার 'কুহুরব,' 'বৌ কথা কও' মনকে মাঝে মাঝে আম হইতে ভুলাইয়া লইয়া যায়। কাকের আর কোকিলের ঝগড়াটা সকলের চেয়ে মধুর।

কাক বড়ই চতুর, কিন্তু কোকিলা চতুরতায় তাহাকেও ঠকাইয়া ধাত্রীর কার্য্য করাইয়া লয়। আমতলার পাশে মাঝারি একটা নারিকেল গাছে কাকেরা বাসা করিয়াছিল। একটী পুংকোকিল যাইয়া কাকেদের উৎপাত করে আর কাকদম্পতি তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, এই ফাঁকে কোকিলা ডিম পাড়িয়া আসে।

মণি দাদা প্রথমে যেদিন এই আশ্চর্য্য খবর আমায় দিল, সেদিন আহার নিদ্রা ভুলিয়া আমি কোকিলের পিছনে চলিলাম। সেদিন আর পাঠশালায় যাওয়া হইল না। একটি অশ্বত্থ গাছে ফুল হইয়াছিল, তাহার ফল খাইবার জন্য কোকিলা বসিয়া ছিল, কিন্তু পুং কোকিলকে দেখিতে পাইলাম না।

কুহুধ্বনি কোকিলের সম্পদ। কোকিলার রব সেরূপ মধুর নহে, চেহারা দেখিলেও হঠাৎ কোকিল বলিয়া মনে হয় না। ধূপ-ছায়া শাড়ীর মত কোকিলার গায়ে রেখা আড়া আড়ি ভাবে কালো ও সাদায় মিশিয়া বিচিত্র রূপ সৃজন করে। অন্যপুষ্ট কোকিলকে কাকেরা প্রায়ই

মারিয়া ফেলে, কোকিলাদের দেখিতে কাকের মতই তাই তাহারা বেশী বাঁচিয়া যায়। পুংস্কোকিল তাই সংখ্যায় কম। দেখিতে অনুরূপ হইলেও জ্যোতিষ্মান্ চক্ষু দেখিয়া উভয়কে চিনিয়া লওয়া যায়। সারাদিন ঘুরিয়া গোধুলির প্রাক্কালে পুংস্কোকিলের দেখা পাইলাম। বটের গাছে পাতার ছায়ায় নিশ্চিন্ত মনে বটফল খাইতেছিল। কোকিলকে পাইয়া সেদিন যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা প্রকাশাতীত।

আবিষ্কারের মাঝে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রস আছে। আট-লান্টিকের মহাসাগর পাড়ি দিয়া কলম্বস প্রথম যেদিন আমেরিকার ভূমি দর্শন করিয়াছিলেন সেদিন তাহার মনে যত আনন্দ হইয়াছিল, পুংস্কোকিলকে বাহির করিতে পারিয়া আমার ততোধিক পুলক হইয়াছিল।

ছায়া-শ্যাম কাননের সেই ছবি মনে পড়ে। বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির লীলানন্দ উপবনের পাতায় পাতায় হরিৎ রাগে খেলিয়া যায়, কুসুম-মঞ্জরীতে চৈত্রলক্ষ্মীর আহ্বান-নৈবেদ্য সমাহৃত হয়, পাতার ফাঁকে নীল আকাশের যতটুকু আয়তন চোখে পড়ে, ততটুকু মেঘের বিচিত্র মাধুরীতে অনুরঞ্জিত। ছায়া-নিবিড়তায় যখন কাননভূমি তন্দ্রালীন, তখন পুংস্কোকিল তাহার স্খলিত কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। আমার ঔৎসুক্য চাঞ্চল্যে প্রকাশ পাইল, তাড়া পাইয়া কোকিল পলাইয়া গেল। উড়ন্ত কোকিলকে দেখিতে পাইয়া কাকদম্পতির ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল। স্বগণ সমভিব্যাহারে কাকেরা কোকিলকে তাড়া করিয়া চলিল।

বাড়ী ফিরিয়া মণিদাকে বলিলাম "মণিদা, আমায় একটা কোকিল ছানা এনে দেবে ?" মণি দাদা অবজ্ঞায় ব্যাপারটা উড়াইয়া দিল; পুরাতন

দিনে তাহাকে কত অবজ্ঞা করিয়াছি, তাহার তালিকা জুড়িয়া বলিল 'না, তুমি যে অবাধ্য, তোমায় আমি কিছুতেই কোকিল ছানা পেড়ে দেব না।'

প্রতিহত বাসনা উদগ্র হইয়া উঠে, আকাঙ্খার আবেগ মনকে চঞ্চল ও অশান্ত করিয়া তোলে। এমন সময় দৈব সুযোগ আনিয়া উপস্থিত করিল।

সংসারে একান্ত চাওয়া জিনিষটী বিফল হয় না, কতবার বড় হইয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছি। পাওয়ার জন্য যখন মন একান্ত উৎসুক হইয়াছে, তখনই প্রাপ্তি সুলভ হইয়াছে। আমরা জীবনে চাওয়াকে একাগ্র ও একনিষ্ঠ করিতে পারি না, তাইত পদে পদে ব্যঘাত ও অন্তরায় আসে।

গাঁয়ের লোকে তাহাকে কেষ্ট বলিত। অন্য পাড়ায় ছিল তার বাড়ী, কিন্তু তার দুরন্ত মন গণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া তৃপ্ত হইবার নহে। গাঁয়ের বন বাদাড়ে, জঙ্গলের মাঝে, সে রাত্রিদিন ঘুরিয়া বেড়াইত। অভিভাবকেরা তাহার অশান্ত চিত্তকে কিছুতেই পাঠশালার রুদ্ধ অচলায়তনে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, কেষ্ট বাগানে বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়। পরের জিনিষ বলিয়া তাহার কোনও ভেদবুদ্ধি ছিল না। সকলকেই সে আপন ভাবিত এবং সকলের জিনিষকে আপনার মনে করিত। চারা নারিকেল গাছের ডাব তাহার জন্য থাকিত না। সময়ের অসময়ের যে ফল পাকুক না কেন, কেষ্ট দেবতার সেবা না হইলে, কাহারও পাইবার যো ছিল না।

গাঁয়ের কোথায় কোন্ ফল, কোথায় কোন্ ফুল, কোথায় কোন্ সুবিধা, সকলই কেষ্টর নখদর্পণে ছিল। সরল ও সুবোধ বালক বলিয়া আমরা

চিরদিন নাম কিনিয়াছি, তাই কেষ্টকে চিরকালই অবজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু আজ তাহার কথা বারে বারে মনে হয়, সে ছিল যেন গাঁয়ের দুরন্ত প্রাণ। বাঁধা-ঘেরা জীবনের প্রাচীরের মাঝে, সে আপনাকে কিছুতেই আটকাইয়া রাখিতে পারে না। মুক্ত প্রকৃতির একান্ত আহ্বান, তাহার মনের মাঝে কেবলই সাড়া দিয়া যায়।

এই সব দুরন্ত ছেলের দল, আজও গাঁয়ে গাঁয়ে আছে, না বিদ্যা-সাগরের প্রদর্শিত আদর্শ গোপালে দেশ ভরিয়া যাইতেছে, তাহা জানি না। তবে এইরূপ বন-শিশুর দল যে দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ধরণীর বিচিত্র উৎসব নিকেতনে কেষ্টর মত ছেলেরা যেন প্রথমজাত শিশুদল। আকাঙ্ক্ষার ও আশার উদ্বেল প্রবাহে তাই তাহারা ভাসিয়া যায়। বুদ্ধির চেয়ে অন্তরকে বড় বলিয়া মানিয়া তাহারা সহজ পথে চলে।

সেদিন সন্ধ্যারাতে শিস্ দিতে দিতে আমাদের বাগান হইতে বাহির হইয়া সদর্পে চলিয়া যাইতেছিল। তাহার নির্ব্বিকার প্রভুত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তুমি কে?' আমার দিকে তুচ্ছ উপেক্ষার হাসিতে চাহিয়া বলিল 'আমি কেষ্ট।' 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'তোদের বাগানে ডাব খেয়ে নিলাম, সারাদিন টো টো করে বড় ক্ষিধে পেয়েছিল কিনা?'

স্বত্ব স্বামিত্বের কোন ভাবনাই তাহার নাই। বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম কতক কৌতূহলে, কতক বিরক্তিতে। 'কোন্ গাছের ডাব খেয়েছ?' 'কেন তার দরকার কি? মারবে নাকি? কড়ই গাছের সাদাফুল

ফুটেছে দেখেছিস, তার পাশেই যে চারা গাছটা তার থেকেই আজ খাওয়া গেল, এর পরদিন দরকার হলে তোদের ন্যাড়া আমতলার গাছ থেকে পেড়ে খাব।'

'সেটায় উঠো না, সেখানে কাকের বাসা আছে। আর কোকিলের ছানাও আছে। কাকে তোমায় ঠুক্‌রে দেবে।'

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সে বলিল 'আমি কি তোর কাকের ভয় করি? বলিস্ কি, সাপ বাঘের ভয় করিনা; সেবার উপেনদার তাল গাছের তাল শাস খেতে উঠে দেখি, এক মস্ত গোখরো সাপ, হাতের দাঁ দিয়ে এক কোপে বাছাধনকে অক্কা দিয়ে দিলুম।' কেষ্টর প্রতি আমার ভক্তি বাড়িয়া গেল। বীর্য্য চিরকালই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাহার কথায় আমার মনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, 'আমায় একটা কোকিল-ছানা পেড়ে দেবে,

হাসিতে হাসিতে কেষ্ট বলিল 'একটা কেন, তোকে দশটা দিতে পারি, যদু বৈরাগীর নারকেল গাছে কোকিল ছানা হয়েছে। কত পাখী পুষতে চাস্, আমি ধরে এনে দিতে পারি। হারুঘোষের জাম গাছে টিয়েরা বাসা করেছে—কাঁচা ধানের মত রঙ, ঠোট দুটী বেশ লাল, টিয়ে চাস্ ত তাও দিতে পারি, নীলমণি ধোপার কড়ই গাছে হলদে পাখীর ছানা হয়েছে—।'

আমি বলিলাম 'আমি কোকিল-ছানা চাই।'

'বেশ, কাল এনে দেব, কিন্তু খাঁচা আছে তোর?'

আমি চিন্তিত ভাবে উত্তর দিলাম—'না'

একান্ত বন্ধুর মত সে বলিল, 'তার আর কি, তোদের বাগানের পাশে তলদা বাঁশের ঝাড় আছে, কাল একটা বাঁশ কেটে এনে খাঁচা করে দেব।'

'কিন্তু ও বাঁশ ত আমাদের নয় ?'

"তাতে কি হয়েছে বোকা, পাখী পুষতে হ'লে খাঁচা চাই, আর খাঁচা করতে হ'লে তলদা বাঁশ চাই, তোদের তলদা বাঁশ নেই, কাজেই ওদের একটা কেটে নিলেই হল, এর আর মুস্কিল কোথায় ?" কেষ্টর যুক্তি মন স্পর্শ করিয়াছিল কিনা জানিনা, কিন্তু খাঁচা পাওয়ার ইচ্ছা বেশী ছিল বলিয়া যুক্তিকে বোধ হয় আমল দেই নাই।

খাঁচার জন্য একটা বাঁশ নিব। ইহাকে বেশী অন্যায় ভাবিতেও পারি নাই। কাজেই কেষ্টর এই সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতে স্বীকৃতি জানাইলাম।

কেষ্ট বলিল 'আমি কাল ঠিক আস্‌ব, এখন আসি কি বলিস্ ?' উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কেষ্ট শিস্ দিতে দিতে চলিয়া গেল। আমি অবাক বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার ছায়াবাজির মাঝে কেষ্ট মিলাইয়া গেল। আমি তথাপি যতক্ষণ তাহার শিস্ শুনিতে পাইলাম, ততক্ষণ এই একান্ত সচল আত্মদৃপ্ত বন্ধুর কথা ভাবিতে লাগিলাম। বয়সে সে আমার অনেক বড় ছিল, কিন্তু তাহার চিত্তের সরলতা সকলকে আত্মীয় করিয়া লয়। বয়সের ব্যবধান ডিঙ্গাইয়া কেষ্ট আমার একান্ত পরিচিত বন্ধু হইয়া দাঁড়াইবে, একথা সেদিন ভাবিতে পারি নাই। কেবল উৎসুক অন্তঃকরণে তাহার সাবলীল গতি, তাহার দুরন্ত তেজ, তাহার বাধাবন্ধনহীন সাহসের কথাই বসিয়া বসিয়া ভাবিলাম।

পরদিন উঠিয়া সকাল হইতে কেষ্টর আগমন পথ চাহিয়া রহিলাম। পাঠশালায় পাতা লিখি, কিন্তু পথের দিকে চাহিয়া থাকি, কেষ্টর দেখা

কখন্ মিলিবে। বাড়ী ফিরিয়া ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেষ্ট এসেছিল ?'

ঠাকুরমা বলিলেন, 'না, কেষ্টর সঙ্গে কি ?'

আমি উৎফুল্ল চিত্তে উত্তর দিলাম, 'কেষ্ট আমায় খাঁচা করে দেবে, আমি কোকিল-ছানা পুষ্ ব।'

দুরন্ত কেষ্ট খাচা বুনিতে আসিবে না মনে করিয়া ঠাকুরমা হয়ত উচ্চবাচ্য করিলেন না। আমার অস্বস্তির সীমা রহিল না। বিকালে পাঠশালায় কিছুতেই মনকে আটকাইয়া রাখিতে পারিলাম না। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গিয়ে মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিলাম 'আজ্ঞে, পন্ মশায় !

"পণ্ডিত মহাশয়" এই গাল-ভরা সম্বোধন গালে আসে না, তাঁহাকে ছোট করিয়া বলিতাম 'পন্ মশায়'। এটাও আবার দ্রুত উচ্চারণে জানিনা শব্দতত্ত্বের কোন্ নিয়মানুসারে হইয়া উঠিত 'পন্নশায়'

পণ্ডিত মহাশয় বিরক্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন 'কি ?'

'আজ্ঞে !'

'আজ্ঞে কি ?'

'আমার পেট ব্যথা করছে, বড্ড পেট ব্যথা' —

'ফাঁকি দিচ্ছিস না ত ?'

উত্তর দেওয়ায় বাধা জন্মিল, কিন্তু মুখ কাচুমাচু করিয়া অপ্রস্তুত হওয়ার লজ্জাকে পেট ব্যথার লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিলাম। তখনকার দিনে সস্তা হোমিওপ্যাথি ছিল না। 'অমিয় পথের' বই পড়িয়া লক্ষণ তত্ত্ব পণ্ডিত মহাশয় শেখেন নাই, কাজেই তাঁহাকে ঠকাইতে কষ্ট হইল না। তিনি বলিলেন 'পড়া করেছিস ?'

'আজ্ঞে পড়া হয়নি।'

সেদিন সারা মনে কেবল খাঁচার কথা জাগিতেছিল। পুস্তকের কালো কালো অক্ষর মিলাইয়া যাইয়া যেন খাঁচার রূপ ধরিতেছিল।

পণ্ডিত মহাশয় উগ্র হইয়া বলিলেন 'তাহলে ছুটি কিসের?'

মুখ কাচুমাচু করিলাম। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন 'তাহলে আজ যা, কিন্তু কাল দুদিনের পড়া দিতে হবে।'

তাহাতে আপত্তি ছিল না। হৃষ্ট চিত্তে গৃহে ফিরিলাম, পেট ব্যথা সত্যই ছিল না, মানস ব্যথা ছিল। অন্তর্যামী এই মিথ্যাকে মিথ্যা ধরিবেন, শিশু মনে তাহা ঠিক ভাবিতে পারি নাই।

সময় চলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, তাই তাহার গতিকে কবিরা নদী গতি কিংবা বায়ু গতির সহিত তুলনা করেন। কিন্তু যেদিন আমরা ব্যাকুল বা ব্যগ্র থাকি সেদিন সময় যেন কিছুতেই কাটিতে চাহে না। সেদিন মনে হয় যেন পলগুলি প্রহরের আয়ু লইয়া চলিয়াছে। কেষ্ট আসিল না।

পাঠশালার ছুটীর পরে মনি দাদা আসিয়া বলিল, 'চল অজিত, আমরা দোয়ারী চিলে উড়াবো।'

সেই প্রিয় আহ্বানও উপেক্ষা করিলাম। চিলের মত আকাশে ওড়ে বলিয়া হয়ত কোনও কবি-শিশু ঘুড়ির নামকরণ করিয়াছিল 'চিলে।' ঝাঁপ দরজার মতন শক্ত বাঁধা, বড় চিলে দরজার মত দেখিতে বলিয়া হয়ত দোয়ারি চিলে। কিন্তু সেদিন দোয়ারী চিলের উড়ন্ত সুষমা দেখিতে মন ভুলিল না।

বেলা শেষে কেষ্ট আসিল। অভিমান হইয়াছিল, কিন্তু নব পরিচয়ে অভিমান প্রকাশ করা সঙ্গত নহে, তাই কেবল ক্ষুব্ধস্বরে বলিলাম, 'এত দেরী করে এলে?'

কেষ্ট আমার ব্যাকুল মুখের দিকে পরুষ স্বরেই বলিল, 'তোর মত আমার ত অবসর নেই, জেলেদের সাথে মাছ ধরতে গিয়েছিলেম, চলন বিলে।'

'চলন বিল কোথায় ?'

হাটের কাছে তেমাথা নদী দেখিস্ নি, ঐখান থেকে আতাই নদী বেরিয়ে গেছে, আতাই বেয়ে যেতে হয়, ওখানে বড় বড় গলদা চিংড়িও পাওয়া যায়, আমি এক টুকরী বোঝাই মাছ এনেছি, তাইত দেরী হয়ে গেল, কিন্তু আর কথা ক'য়ে কাজ নেই, তাড়াতাড়ি একটা দা নিয়ে আয়।

আমি দা আনিয়া কেষ্টর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলাম। কেষ্ট বলিল, 'সন্ধ্যে হয়ে আস্ছে, তোর আর যেয়ে কাজ নেই, তুই চুপ করে বসে থাক, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাঁশ নিয়ে ফিরছি।'

সন্ধ্যা বেলায় বাগানের দিকে যাইতে দেখিলে মায়ের কাছে বাধা ও ভর্ৎসনা পাইব, তাহা জানা ছিল, কাজেই আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কেষ্ট কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরিল।

তার পর খাঁচার কাটীর মত মাপ অনুযায়ী বাঁশের খণ্ড করিয়া বাঁশ চিরিয়া ফেলিয়া শলা তৈরী করিল। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার নিপুণ হস্তের কাজ দেখিতে লাগিলাম।

দক্ষ কারিকরের মত কেষ্ট অবলীলাক্রমে বাঁশ চিরিয়া ফেলিল পরে কাজ করিতে করিতে বলিল 'কিন্তু বেত চাইত ? আমি ভাবনায় পড়িলাম। কেমন করিয়া বেত সংগ্রহ করিব ভাবিয়া পাইলাম না। আমাকে চিন্তিত দেখিয়া কেষ্ট বলিল, 'তার জন্য ভাবনা কি, তোদের গোয়াল ঘরে বেত আছে, তাতে বেশ হবে। সেগুলি এনে চাঁচ্তে হবে, তারপর সরু দড়ি করে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে বুঝ্লি।'

বুঝিলাম কিন্তু সে বেত কোন্ প্রয়োজনে কে রাখিয়াছে কে জানে। ঠাকুরমা কোনও কাজে সেখান হইতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া কেষ্ট বলিল, 'দিদি! আপনাদের গোয়াল ঘরে যে বেত আছে, তার একটা বেত নিতে হবে।'

প্রশ্নকর্ত্তা সম্মতির অপেক্ষা রাখে এরূপ মনে হয় না। ঠাকুরমা ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, 'কে কেষ্ট? কেন কি করবি?' 'অজিতকে খাঁচা বানিয়ে দেব কি না।'

"তোকে বারণ করে লাভ নেই, কিন্তু বেশী নষ্ট করিস না যেন।" কেষ্ট রাত পর্য্যন্ত বসিয়া খাঁচা তৈয়ার করিয়া ফেলিল। সে খাঁচা পাইয়া আমার আনন্দের অবধি রহিল না। কেষ্ট দুষ্ট কিন্তু গুণী—৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে এমন সুন্দর খাঁচা তৈয়ার করিয়াছিল যে বাড়ীর লোক অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

মা ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখী পুষিস্ নে অজিত, তোকে যদি কেউ নিয়ে যায়, তাহলে আমার কি কষ্ট হয় বুঝিস্?'

মায়ের বেদনা কতক হয়ত বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু মন যখন অভিলষিতকে পাইতে ব্যগ্র, তখন আমরা নীতিকে মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করি। তাই তাঁকে বলিলাম, 'তার আর কি কষ্ট? যারা নিয়ে যাবে, তারা যদি ভাল খেতে দেয় মা, তাহলে আর দুঃখ কিসের? সেবার নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম না, তাতে আর কি কষ্ট হয়েছিল?'

মা শুধু আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'সে কথা তুই বুঝ্‌বিনে অজু, বড় হ'য়ে যখন ছেলের বাপ হবি, তখন বুঝ্‌বি।'

মায়ের সেই ভাবগর্ভ কথা কাল-সাগর পাড়ি দিয়া অন্তরের দ্বারে আসিয়া আঘাত দেয়; আজ পুত্রের পিতা হইয়া মায়ের সেই দরদ ভরা কথার মর্ম্ম বুঝিতেছি। পুত্রের প্রতি এই যে মমতা, একে শুধু অন্ধ স্নেহ বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারি না, এই মমতাই সৃষ্টির উৎস। এই মমতাই বিধাতার মায়া শক্তি, তাহাকে সত্যরূপে জানিলে ভয় থাকে না, কিন্তু সত্যরূপে জানিতে কয় জনে চেষ্টা করে?

মায়ের বারণ শুনিলাম না। কয়েক দিন পরে কেষ্ট আসিল। উভয়ে তখন বাগানে গেলাম। কেষ্ট অবলীলাক্রমে নারিকেল গাছে উঠিয়া গেল, কাকেরা কা কা করিয়া উঠিল।

বাগানে যত পাখী ছিল, সঙ্গে সঙ্গে যেন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কি আকুল ক্রন্দন! মৌন ভাষায় নহে, যেন সুস্পষ্ট ভাষায় তাহারা এই গর্হিত কার্য্যের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তখন তাহাতে দুঃখ অনুভব না করিয়া পুলকই অনুভব করিয়াছিলাম। কেষ্ট একটী কোকিল-ছানা নিয়া নামিয়া আসিল। কেবল পাখা উঠিতেছে, উজ্জ্বল মসৃণ কালো রঙ, চোখের কোণে পাটলিমা আর সুন্দর বৃত্তাকার চক্ষু, কোকিল-ছানাকে দেখিয়া আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। কেষ্টকে বলিলাম, 'আমার হাতে দাও।'

কেষ্ট বলিল, 'ওরে না, এখনই পাখীরা তাড়া করবে, চল্ বাড়ী গিয়ে দেখ্‌বি।'

বিজয় গর্ব্বে বাড়ী ফিরিলাম। পিছনে কাক, শালিক ও কোকিল ডাকিতে ডাকিতে আসিল। ডাকিয়া ডাকিয়া ক্রন্দন বৃথা জানিয়া চলিয়া গেল।

বায়সী কোকিল শাবকের ধাত্রী, তথাপি তাহার মায়া কম নয়, সে বারে বারে কা কা করিয়া ডাকিতে লাগিল। সেই বেদনার্ত্ত কা কা স্বরে যেন সন্তান-হারা জননীর অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ ফুটিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু আমি তখন বধির। পক্ষীশাবককে খাঁচায় পুরিয়া বাড়ীর সকলকে নিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলাম।

পাখী ত হইল। কিন্তু তাহার খাওয়ার ভাবনা কম নয়। ক্ষুদ ভিজাইয়া খাওয়াইতাম। তাহার ভিতর একটু একটু দুধ দিয়া দিতাম। মাঝে মাঝে মুখে পুরিয়া দিতে হইত।

পাখীরা কয়াপোকা ভালবাসে। পাঠশালার পড়া শেষ হওয়া মাত্র মাঠে মাঠে যাইয়া কয়া ধরিতাম। কয়াগুলির রং কচি ঘাসের মত, ঘাসের মধ্যে লুকাইয়া আত্মগোপন করে, কিন্তু আমার সতর্ক দৃষ্টি এড়ান তাহাদের পক্ষে মুস্কিল।

বাড়ীতে যে আসে তাহাকে পাখী দেখাই, সমবয়সী সাথীদের কথা কয়েকদিন একেবারে ভুলিয়াই গেলাম। পড়ার ক্ষতি হইতেছে বলিয়া বাবা একদিন ধমক দিলেন। বাবা আমায় জীবনে শাসন করেন নাই। শাসনের জগদ্দল পাথর বর্ত্তমান শিশুচিত্তকে পীড়িত করিয়া তুলে। স্বাভাবিক বিকাশকে প্রতিরুদ্ধ করে, কিন্তু আমার জীবনে শাসনের সেই রুদ্ররূপ কখনও দেখি নাই।

পিতার অনুশাসনে পড়া আরম্ভ করিলাম। নূতনের মোহ খানিক কাটিয়া গেলে কোকিল-ছানা সমস্ত অন্তরকে ভরিয়া রাখিল না, তখন বাড়ীর লোককে কোকিল শাবকের যত্ন আদর করিতে দিতাম। সাত সরিকের বাড়ীর ছেলেপিলের দল সবাই আসিয়া পাখীর চলা-ফেরা

কৌতুকের সহিত দেখিত। কেষ্ট ছিল এসব বিষয়ে ওস্তাদ, মাঝে মাঝে আসিয়া পক্ষিপালনের কৌশল শিখাইয়া দিত।

চোখের সম্মুখে শাবক বাড়িতে লাগিল। জীবনের এই প্রকাশ আমার শিশু অন্তরে ছাপ দিয়াছিল। প্রাণরহস্যের গোপন চাবি আজিও খোলে নাই, কোনও দিন খুলিবে কিনা ভগবানই জানেন। পুষ্প ও ফল চোখের সম্মুখে বাড়ে, কিন্তু তাহাদের পরিণতিতে গতির অভাব, তাই সে বিকাশ মনের মাঝে রহস্য জাগায় না, কিন্তু পাখীর ছানার দিনে দিনে পাখা শক্ত হইতে লাগিল, সে আস্তে আস্তে ছটফট করিতে আরম্ভ করিল, আস্তে আস্তে খাঁচার অল্প পরিসরে উড়িতে আরম্ভ করিল।

জীবনের এই প্রকাশমান লীলা সত্যই রহস্যময়। বিজ্ঞান যে কথা বলে, তাহাতে মন সায় দেয় না। আমাদের আশা ভরসা দিয়া, আমাদের কল্পনা দিয়া, আমরা জগৎ গড়ি। আমরা ভাবি, এই বিচিত্র বিপুল বিশ্বজগৎ মানুষের আনন্দের জন্য, মানুষের প্রয়োজনের জন্য, মানুষের সুখের ও সুবিধার জন্য।

বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে। অনন্ত দেশ আর অনন্ত কাল। মানুষের ও প্রাণীর জন্য এই অনন্ত দেশের লক্ষ লক্ষ পরার্দ্ধেরও কম ভাগের ভাগ বর্ত্তমান। প্রাণবান্ পৃথিবীর আশে পাশে কেবলই মহাশূন্যতা —সেখানে যে সব দেশ আছে তাহাতে প্রাণ নাই, হয় তাহার বক্ষে অসহ অগ্নিজ্বালা, না হয় অতি শীতল তুহিন স্তূপ। প্রাণীর জন্য এই অতি বিশাল, অতি বিরাট জগতের সৃষ্টি হয় নাই।

বিজ্ঞান আশা করে একদিন রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে সাধারণ পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগকে অবলম্বন করিয়া প্রাণ-শক্তিকে আবিষ্কার করিবে। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ বিজ্ঞানের দাবী,

বিজ্ঞানের ভয় ও আশঙ্কার কথা ভুলিয়া, প্রাণশক্তির অচিন্ত্য মহিমার কথা বিস্ময়ে ধ্যান করিতে পারি।

কিন্তু প্রাণ-শক্তির বিকাশের এই কবিত্ব-রসময় লীলা বহুদিন দেখিবার সুযোগ হয় নাই। দৈব আসিয়া একদিন প্রিয়তম পক্ষি-শিশুকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

চৈত্রের শেষে ও বৈশাখে বনে বনে পাখী ডাকে 'বৌ কথা কও'। হলুদ বরণ পাখী তার লাবণ্যময় কান্তি আর সুস্বর দিয়া মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। কথাটীর রূপান্তর করিলে শুনায় 'বৌ স'ষো কোট' 'বৌ স'ষো কোট'।

বৈশাখেই আমাদের দেশে কাসুন্দী পর্ব্ব। সাধারণতঃ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে কাসুন্দী কোটা হয়। রাই সরিষা ঢেঁকিতে সূক্ষ্ম করিয়া, গরম জলে ফেলিয়া, নুন, হলুদ ও মশলা মিশাইলে কাসুন্দী তৈয়ার হয়, ইহার সঙ্গে তেঁতুল বা আম মিশাইলে অন্য প্রকার রকমফের কাসুন্দী তৈয়ারী হয়।

কাসুন্দী প্রস্তুতি একটী পর্ব্ব, একটী উৎসব। সকল বাড়ীর মেয়েরা শুদ্ধাচার হইয়া কাসুন্দী তৈয়ার করে। শুদ্ধ ও শুচি না হইলে কাসুন্দী ভাল হয় না। বিলাতি খানার মাষ্টার্ড (mustard), কিন্তু কত যত্নে কত আদরে পুরললনারা কাসুন্দী উৎসব করেন।

কথায় কথায় বাহিরের কথা মনে পড়ে। রন্ধনকে আমরা চির-কালই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়াছি। অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করিয়া, শুচি শুভ্র হইয়া ভক্তিমতী হইয়া অন্নের উপায়ন করিতে হইবে।

অন্নপূর্ণার দেশে আজ অন্নপূর্ণার অভাব হইতেছে। জননী ও ভগিনীরা অন্নের উপায়নকে আর সাত্ত্বিক ও শুদ্ধভাবে করিবার প্রয়োজন

মনে করেন না। দুঃখের বিষয় শুচিতাকে তাঁহারা অতীতের কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেছেন।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বাড়ীর সবাই কাসুন্দী কুটিতে ব্যস্ত। আমরা সব দল বাঁধিয়া দূরের মাঠের আম গাছ হইতে আম পাড়িতে গিয়াছি। আমের কাসুন্দী হইবে, মজা করিয়া খাওয়া যাইবে।

বাড়ীতে ফিরিয়া দেখি খাঁচা শূন্য। দুঃখে ও বেদনায় চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মাটীতে আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম—'আমার পাখী, আমার পাখী'।

কান্না শুনিয়া সবাই ছুটিয়া আসিল। ঠাকুরমা পাখী নাই দেখিয়া বলিলেন 'কাঁদিস্‌নে, দাদু।' কান্না থামে না। কতক দুঃখে ও কতক ক্রোধে চীৎকার করি 'আমার পাখী এনে দাও'।

তখন খোঁজ খোঁজ পড়িল। বাড়ীর সকলে মিলিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিল। কোকিল শাবকেরই মায়া বাড়িয়াছিল। অনেক পরে পাশের বাড়ীর হেনা আসিয়া বলিল, 'সে পাখী বিড়ালে খেয়েছে, মাচার তলে তার হাড়গোড় দেখা যাচ্ছে।'

উঠিয়া মাচার তল দেখিতে গেলাম। দেখিলাম পাখীর হাড় কয়খানি পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষোভে ও দুঃখে আমি কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না।

চেঁচাইতে চেঁচাইতে বলিলাম, 'বল, কে খাঁচার দরজা খুলে রেখেছে, তাকে আমি মেরে ফেলবো।' কেহই উত্তর দেয় না। নিরুপায় আমি ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে বিড়াল তাড়া করিয়া ফিরিলাম। বাড়ীর পুষি, মেনি সেদিন লাঠির আঘাত খাইয়া সায়েস্তা হইল।

কোকিল শাবকের অপমৃত্যু আমার মনে শোক জাগাইয়া তুলিল। ছোট বয়সে মৃত্যুর যথার্থ রূপ মনে প্রতিভাত হয় না। কোকিল-ছানার মৃত্যু কিন্তু আমায় কাতর করিয়া তুলিল। কয়েক দিন পর্যান্ত মনে কোন আনন্দই পাই নাই, খেলা ধূলা আমোদ প্রমোদ করি নাই।

ঠাকুরমা বলিলেন, 'তুই কাঁদিস্‌নে, সাম্‌নের সোমবারে সুবচনী পুজো দেব, তাহলে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'

শিশুমন নূতনকে পাইলে, পুরাতনকে ভুলিতে দেরী করে না। ব্যথার আঘাত রহিয়া যায়, তথাপি নূতন নূতন আশা ও আনন্দে, শিশু অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎকে আঁকড়াইয়া ধরে। ভবিষ্যতের পানে এই দৃষ্টি আছে বলিয়াই জীবনে গতি সম্ভব।

—— ॰ ——

৭
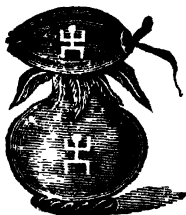
পাল পার্ব্বণ উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর বার মাসে তের পার্ব্বণ ছিল। ঋতু গতির সহিত মিলাইয়া যে সব ভাবুক ও মনস্বী ব্রত পার্ব্বণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাহাদিগকে আমি শত শত নমস্কার করি। এই সমস্ত উৎসবের পিছনে কোথাও কোথাও কোনও জড়তা, কোথাও কোথাও কোনও অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ছিল, কিন্তু সকলের উপর যে কাব্য ছিল তাহা নিরপেক্ষ সকলকেই বলিতে হইবে।

এই সমস্ত ব্রত পার্ব্বণের মাঝে লোভ ও বাসনা যে ছিল না, তাহা বলি না, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী ছিল একটী ভাবমধুর আবহাওয়া। সে আবহাওয়া আর হয়ত ফিরিবে না। আমাদের জীবনে প্রয়োজন আজ বাড়িয়া গিয়াছে। স্নেহমধুর একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই প্রতি পদে পদে সংসারের জ্বালা আমাদের ঘিরিয়া ধরিতেছে। ব্রত পার্ব্বণের জন্য যে মনের ও কাজের অবসর চাই, সে নিরবচ্ছিন্ন অবসর জীবনে বোধ হয় আর ফিরিবে না, তাই সুবচনী ব্রতের স্মৃতিটা এখানে বলিয়া লই।

রাত্রি শেষের শোভা কি অনুপম, কি ভাবগাঢ়! নিশীথ রাত্রির জমাট তিমির সরিয়া গিয়াছে, ঊষার আবির্ভাবের একটী আভাস উদয় দিগন্তে প্রকাশিত হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া তরুশাখে পাখীরা ডাকিয়া যায়। আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইয়া ওঠে। শান্ত শীতল বাতাস ফুল-সৌরভ বহিয়া বহিতে আরম্ভ করে। অব্যক্ত ব্যক্ত হইবে, অপ্রকাশ প্রকাশ হইবে, তাই যেন চারিদিকে বিচিত্র আয়োজন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাই পুব আকাশে তখন চন্দ্রকলা ম্লান জ্যোতিতে

উদ্ভাসিত ছিল। ঠাকুরমা উঠাইয়া দিলেন, আমি রোয়াকে বসিয়া উষার আবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিলাম।

সাত সরিকের বাড়ীর তেমাথা পথ। সেখানে বরণ-ডালা রাখিয়া ঠাকুরমা পরিষ্কৃত গোময় লেপিত স্থানে সিন্দূর দিয়া স্বস্তিক আঁকিলেন। তাহার পর পিত্তল ঘটে তিনটী পান ও একটী সুপারী দিয়া মঙ্গলঘট স্থাপন করিলেন। হুলুধ্বনি দিতে অন্য অন্য বাড়ী হইতে বর্ষীয়সী নারীরা এবং কৌতূহলী দুই চারিজন শিশু আসিল।

শেষ রাত্রির আরাম-শয়ন ছাড়িয়া অনেকেই আসিতে চাহে না। কাজেই লোক সমাগম বেশী হয় না। পানের উপর একটী করিয়া কলা, এইরূপ পাঁচ ছয়টী কলা মঙ্গল ঘটের চারিপাশে রাখিয়া দিলেন। তাহার পর ধান দুর্ব্বা লইয়া কিরূপ কি পূজা করিলেন, তাহার খুঁটী ব্যবস্থাটা বলিতে পারিব না, কারণ বড় হইয়া সুবচনীর পূজায় যোগ দিতে পারি নাই। ছোট বয়সে পূজারীতির চেয়ে কদলীর উপর লোভ ছিল বেশী।

ঠানদিদির দলে পরস্পর আলাপ পরিচয় আরম্ভ করিলেন। পূজার ফাঁকে ফাঁকে মনের গোপন কথাগুলি বলিয়া লইলেন। অবশেষে কথা আরম্ভ হইল।

ব্রতের উপকরণ সামান্য, আয়োজনও অনাড়ম্বর, কিন্তু ব্রতকথাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিলে চলিবে না। ঠাকুরমা কথা আরম্ভ করিলেন।

ছোট বয়সে ব্রতকথা শুনিবার চেয়ে রম্ভালাভের দিকে মন ছিল বেশী তাই স্মৃতি সমস্ত কথা বাঁচাইয়া রাখে নাই। সব মনে নাই, গোড়ার কথা ভুলিয়াছি, আগার কথা ভুলিয়াছি।

ঠাকুরমার কণ্ঠ যেন আজ সময় সাগর ভেদ করিয়া কানে বাজে। ভাষার সেই সরল ছন্দ, বলিবার সেই মোহময়ী ভঙ্গী, গদ্যছন্দের সেই সুললিত রূপ আর কোথায় পাই ?

অরুণ জঙ্গলের পাশ দিয়া, পথ রাজবাড়ীতে চলে। রাজবাড়ীতে উৎসব—ভারে ভারে দ্রব্য চলিয়াছে। গোয়ালা বাঁকে করিয়া দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, নবনী নিয়া যাইতেছে। এমন সময় জঙ্গলের পথে দেখা মিলিল বৃদ্ধ জরদ্গব বুড়ীর—ফ্যাচড়া-চুলে বুড়ী, মাথায় শোণের নুড়ী—বুড়ী কাতর হইয়া গোয়ালাকে বলিল, 'বাবা, আমায় একটু দই দে।' গোয়ালার ক্রোধের সীমা নাই। বুড়ীকে রাগিয়া বলিল, 'এ দই দেখে নোলা বাড়িও না, রাজবাড়ীতে দই যাচ্ছে, এ থেকে তোমায় দিতে পারি না।' বুড়ি কথা কহিল না, গোয়ালা চলিয়া গেল। পরে ভার নিয়া আসিল মৌ-ওয়ালা। কলস ভরা মৌ লইয়া রাজবাড়ীতে চলিয়াছে। বুড়ী চাহিল, 'আমায় একটু মৌ দে, আমি কয়দিন খাইনি।' 'হ্যাচলা পরা ফ্যাচড়া চুলে বুড়ী তুই, তোর আক্কেলটা কি, এ মৌ যাবে রাজবাড়ীতে, এর থেকে কি আগে দেওয়া যায় ?' বুড়ী কথা কহিল না চলিয়া গেল।

ভারে ভারে তখন মিঠাইওয়ালা চলে। কেহ ক্ষীর নেয়, কেহ খইচুর, কেহ মতিচুর, কেহ মনোহরা, কেহ সন্দেশ, কেহ ক্ষীরমোহন, কেহ লালমোহন—। রাজপথে বুড়ী আসিয়া প্রত্যেকের নিকট চাহে, সকলেই প্রত্যাখ্যান করে। বিরস বদনে বুড়ী আসিয়া বনের ছায়ায় মিলাইয়া যায়।

এদিকে আশ্চর্য্য ব্যাপার। ভার-ওয়ালারা যেই রাজবাড়ীতে পৌছায়, দেখে তাহাদের ভাণ্ডার শূন্য। গোয়ালার দইয়ের ভাঁড়ে

পোকা কিলবিল করিতেছে। সন্দেশের হাঁড়ী খালি। তাহারা সকলে মাথায় হাত দিয়া বসিল।

রাজার আদেশ তাহাদের গর্দ্দান নিবে। নিরুপায় তাহারা কয়দিনের সময় যাচ্ঞা করিল। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া সেই অরুণ জঙ্গলের বটতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বুড়ীর খোঁজ করিল.। বুড়ীর পা ধরিয়া তাহারা কাঁদিয়া পড়িল।

সুবচনী আর কেহ নহেন—শুভচণ্ডী, আপন পূজা প্রকাশের জন্যই তাহার জরতী বৃদ্ধার বেশ। বুড়ী কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনা দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন, শুভচণ্ডী পূজার শুভ রীতি বলিয়া দিলেন। লাঞ্ছিতেরা লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি পাইল।

সমস্ত কথা মনে আসে না। বাংলার ব্রত কথা এখনও সমস্ত লেখা হয় নাই। লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ব্রত কথার বিশিষ্টতার মাঝে, বাঙালীর জীবন যাত্রার একটী সহজ সরল রূপ লুক্কায়িত আছে। বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, পুরললনারা এই ব্রতবিধির সৃষ্টি করিয়াছেন। ভয়ে ও অপরিচয়ের আড়ালে যিনি বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহার মূর্ত্তিকে বাঙালী মায়েরা কেমন করিয়া ফুটাইয়াছেন, সে কথা সত্যই উপভোগ্য। জননী ও ভগিনীরা বাংলার এই নিজস্ব মাধুর্য্য হারাইতে বসিয়াছেন। এখনও যে সব জরতী ঠান্‌দিদি ও ঠাকুরমারা আছেন, তাঁহারা গেলে আমাদের জীবনের একটা দিক একেবারে হারাইয়া যাইবে।

ঠাকুরমা গল্প বলেন। অবাক হইয়া শুনি, পূব আকাশে চাঁদ ডুবিয়া যায়। ঊষার বিকাশ মনের মাঝে ছাপ রাখিয়া যায়। পাখীর কাকলী অন্তরে সাড়া দেয়।

এই সুন্দর পরিবেশ কদলী হইতে মন ফিরাইয়া লয়। হুলুধ্বনি শুনিয়া মণি দাদা কখন আসিয়াছিল জানি না। ব্রত কথা শেষ হইতেই মণি দাদা সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট কলাটি নিয়া বসিলেন। তখন কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। আমি বলিলাম, 'ও কলা আমার, অনেকক্ষণ থেকে ওটা আমি নেব ঠিক করে রেখেছি।'

সঙ্কল্প হ'লেই যে জিনিষ পাওয়া যায় না, একথা ঠেকিয়া শিখিতে হয়। আদর-লালিত আমি মনে করিতাম, সঙ্কল্প ও সিদ্ধি নিরবচ্ছিন্ন যোগে যুক্ত।

ঠাকুরমা আমায় কোলে তুলিয়া বলিলেন, 'ঝগড়া করে না, দাদু, আমাদের পূজা, ভাল জিনিষ ত পরকে দিতে হবে।'

এই উদারতা মনে স্থান পায় না। আমি তাই গলার জোর আর কান্না মিশাইয়া বাহানা করি। ঠাকুরমা অন্য একটী কলা হাতে দিয়া বলেন, 'ছি, তুমি দিনে দিনে বড় হচ্ছ, এ কান্না তোমার শোভা পায় না।'

যখন তাহাতেও থামি না, তখন ঠাকুরমা বলিলেন, 'কেঁদো না, তাহ'লে সুবচনী ঠাকুর রাগ করবেন।'

কান্না থামাইতে হইল। কতক ভয়ে, কতক শঙ্কায়, কতক অনিশ্চিতের প্রতি সহজাত কৌতূহলে আমি সুবচনীর রূপ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলাম।

'মঙ্গল-চণ্ডীর গীতি করে জাগরণে।' আমার মনে বরাভয়দায়িনী সেই রূপ জাগিল না। শুভদায়িনীর ভয়াবহ মূর্ত্তি মনে কল্পনা করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মণি দাদা তাহাদের বাড়ীর লোকের কাছে বকুনী খাইয়া ফিরাইয়া দিতে আসিল। আমি স্বার্থত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'তুমিই নাও, দাদা।'

এই স্বার্থত্যাগ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া করিয়াছিলাম কিনা বলা মুস্কিল, কারণ মনে ভয় ও উপদেশ যুগপৎ কাজ করিতেছিল।

রাত্রে শুইয়া ঠাকুরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গল্প শুনিতেছিলাম। নীতি দিদি চলিয়া গিয়াছে, একাকী সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের রসধারা নিঃশেষে পান করিতেছিলাম।

স্তিমিত দীপালোকে ঝিনুক রাজকন্যার গল্প শুনিতেছিলাম। ঝিনুকের মাঝে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজকন্যা থাকিত। মাঝে মাঝে উঠিয়া সে সরোবরের কালো জলে খেলা করিয়া বেড়াইত। রাজার ছেলে বনে মৃগয়া করিতে যায়, পথে ঝিনুক কন্যাকে দেখিয়া ভালবাসায় পড়িয়া গেল।

গল্পের শেষ হইতে না হইতে ঘুম জড়াইয়া আসিতেছিল। আমি গল্পের মোহ ভুলিয়া ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঠাকুমা! সুবচনী পূজা ত হল, কিন্তু আমার দুঃখ ত যায়নি, কোকিল-ছানার জন্য আমার মন যে এখনও পোড়ে।'

ঠাকুরমা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। আমাকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর দেবতার উপর ভক্তি না থাকলে হয় না, দাদু! সব মন এক করে ভাবো, তাহলে তোদের কোন দুঃখই থাকবে না।'

সেই রাত্রি, সেই স্তিমিত দীপালোক, সেই কণ্ঠস্বর আজিও মনে পড়ে। মৃত্যুর যে অজ্ঞেয় রহস্য, তাহা প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু সেই বর্দ্ধমান চিত্তে ঠাকুরমা যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, বড় হইয়া তাহাতে ফল ফলিয়াছিল। বড় হইয়া বৈদান্তিক মতে আসক্তি থাকিলেও, যে শরণাপত্তির অনির্ব্বচনীয় শান্তি পাইয়াছি তাহার মূলে ঠাকুরমার শিক্ষা।

পূজা পার্ব্বণের আবহাওয়া মনকে আমার কখনও পঙ্গু করে নাই, তাই লোকে যখন আমাদের ধর্ম্মকে পৌত্তলিক বলে, তখন অবাক হইয়া গত দিনের কথা ভাবি, আর ঠাকুরমার দিব্য ভাস্বর আনন্দোজ্জ্বল মুখের কথা স্মরণ করি। লেখা পড়া তিনি করেন নাই, শাস্ত্র ধর্ম্ম জানিতেন না, কিন্তু এমন সরল সহজ বিশ্বাসে ধর্ম্মের সারতত্ত্বকে গ্রহণ করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।

আমি অন্ধকারের মধ্যে ঠাকুরমার গায়ে পা তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সুবচনী ঠাকুর কি আমার জন্য ভাব্‌বে।' 'ভাব্‌বে বই কি দাদু! সবার জন্য যে তাঁর ভাবনা। কীট পতঙ্গ, জড় অজড় সকলই তাঁর করুণায় বেঁচে আছে. যখনই দুঃখ হবে তাঁকে ডেকো, তিনিই দুঃখ হরণ করবেন।'

মঙ্গল-চণ্ডী, শুভচণ্ডী আমাদের দুঃখহারিণী ভয়-বিনাশিনী দেবী। চারিপাশে যে দুঃখ ও অত্যাচার জমিয়াছিল, তাহার লাঞ্ছনার মাঝে আত্মরক্ষার জন্য, নির্ভরতা ও আশ্রয় লাভের জন্য বাংলার ছায়াশ্যাম কুটীরে কুটীরে তাঁহাদের রূপ ফুটিয়াছিল।

ঘুম-ভরা চোখে, স্বপ্ন-ভরা প্রাণে, আমি সুবচনীর সেই কল্যাণী মূর্ত্তি অনুভব করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। দুঃখ ও দৈন্যের বোঝা যখন মানুষের অসহ্য হইয়া ওঠে, সংসারে মানুষ শান্তি পায় না, তখনই মানুষ অপরিচিত অজ্ঞেয়ের কাছে আত্মনিবেদন করে। এরূপ কোনও আবির্ভাব হইয়াছিল কিনা জানি না। পরদিন ভোরে যখন জাগিলাম, তখন সমস্ত ব্যথা যেন দূর হইয়া গিয়াছে। বারান্দায় আসিয়া লাফাইতে লাফাইতে অকারণ পুলকে চেঁচাইতে লাগিলাম।

মা নম্রস্বরে বলিলেন, 'চেঁচাস্‌নে অজু, তোর ঠাকুরদা ফিরেছেন।' ঠাকুরদা বাঘ-রাশি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আগমনে সমস্ত বাড়ী ভয়ে থম থম করে, ভয় না করিলেও চীৎকারের সাহস রহিল না। আমি মেনি বিড়ালকে লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিলাম।

নিঃসীম আকাশ। গ্রহ নক্ষত্র তারকার জ্যোতিঃ চোখে ভাসিয়া আসে। স্তব্ধ বিস্ময়ে অনন্ত শূন্যের বিরাট মহিমার কথা চিন্তা করি। রজনী গন্ধার মৃদু সৌরভ দক্ষিণ পবনে উতল হইয়া ওঠে। দূরে বাবলার শাখায় নিশাচর পাখী ডাকে।

মৌন রাত্রির মৌনতায় ভূমার অনুভূতি যেন কিছু কিছু জাগে। এই অসীমতার মতই বিচিত্র মানুষের মন—এমনই মহান্, এমনই বিরাট, এমনই অতলস্পর্শ।

স্মৃতির গোপন ও সদর কত মহাল। সেই রংমহালের চাবি খুলিতে বসিয়া দেখি, জীবনের কত হারানো ঘটনা, কত হারানো সুর, কত হারানো চিত্র, কালের সমুদ্র পাড়ি দিয়া চোখের উপর ভাসিয়া আসে।

মনের অবচেতন লোকে তাহারা এতদিন কি খেলা করিতেছিল, কে জানে? তুচ্ছ ঘটনার ছাপ এমন করিয়া অমর হইয়া আছে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে অন্তর আনন্দরসে আপ্লুত হয়। যাহা ছিল একান্তই মুহূর্ত্তের সঙ্গী—তাহারা পূর্ণের ও নিত্যের স্নেহস্পর্শে চিরন্তন হইয়া গেছে।

আমাদের বাড়ীর পুরাতন নদী-ঘাটের নাম ছিল বৈরাগী-ঘাট। ঘাটের পাশে পাশে বৈরাগী বৈষ্ণবেরা বাসা বাঁধিয়াছিল—তাহাদের নামেই নামকরণ হইয়াছিল।

ঘাটের পথেই রথ-তলা। রথতলায় জিওলির খুঁটি দেওয়া খড়ে-ছাওয়া চালা-ঘর। আর তাহার মাঝে কাঠের সুউচ্চ রথ। যাহারা রথ করিত, তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল—তাই তাহারা রথোৎসব

করিতে পারিত না। বর্ষের পর বর্ষ, শীত ও গ্রীষ্মে অচল রথ অচল হইয়া, আমার শিশু মনের চারি পাশে এক অজ্ঞাত কল্প-লোক সৃষ্টি করিয়া তুলিত।

ঠাকুরমা পুরী গিয়াছিলেন—জগন্নাথের রথের কাহিনী জানিতেন। তিনি গল্প বলিলেন—রথ একদিন চলিতে চলিতে হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়—তখন ডাক পড়িল ভক্তের, ভক্ত ছিলেন নির্জ্জনে বকুল বীথিতে তপস্যামগ্ন—সহস্রের অনুনয়ে এলেন। ভক্তের হস্তস্পর্শে অনড় রথ নড়িল।

সে গল্প শুনিয়া ভাবিতে বসিলাম—আমি যদি তেমনই ভক্ত হইতে পারিতাম—তবে আমাদের গাঁয়ের এই অচল রথ চালাইয়া দিতাম।

অতীত বিস্মৃত যুগের ধ্রুব ও প্রহ্লাদের সাধনার কথা মনে পড়িত, মনে মনে সঙ্কল্প করিতাম—তাহাদের মত তপস্বী হইয়া এই দুঃখ-মলিন কাঠের ঘোড়াকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিব।

সে তপস্যা যে কালে আরম্ভ করিব সে কাল কখনও আসে নাই—তাহা কালের অদৃশ্য সাগর-ঢেউয়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কাঠের ঘোড়ার সতৃষ্ণ আবেদন মনে অনুকম্পা ও মোহ জাগাইলেও, সে আগুন জ্বালাইতে পারে নাই—যে আগুন অমিতাভ বুদ্ধের মনে জাগিয়াছিল।

রথটি ছিল ভৌমিক পরিবারের। তাহাদের কেহ চাকুরী করিয়া ধনী হইয়া আসিয়া সেবার রথ চালাইবে বলিয়া ঘোষণা দিল। এ সংবাদ যখন শুনিলাম তখন উচ্ছ্বসিত আনন্দ লুকাইয়া রাখিবার স্থান হইল না।

মণিদাকে বলিলাম, 'রথের দিন সকাল সকাল যেতে হবে?' মণিদা বলিলেন—"না, তোকে নিয়ে যাবো না—তুই তোর লাল-নীল পেন্সিলটা দিস্ নি?"

কাকামণি দিয়াছিলেন পেন্সিলটি—সে পেন্সিল কিছুতেই হাত ছাড়া করিতে পারি না—দুর্দ্দমনীয় লোভের খাতিরেও নয়। 'বেশ! তাহলে আমি রাজকুমারের সঙ্গে যাবো—।' মণিদা নিস্ফল ক্রোধে বলিয়া ফেলিল, 'তা গেলি, বয়ে গেল, আমরা তোকে নেব না—'

আমিও রাগিয়া উঠিলাম, 'তা আমারও বয়ে গেল।' রথের দিন রাজকুমারের সাথে রওনা হইলাম। রাজকুমারের ছিল বরিশালের পাড়াগাঁয়ে বাড়ী—তার ভাষা ছিল বিকৃত – কিন্তু তার মাঝে যে মিষ্টতা ছিল, তা যেন এখনও কানে বাজিতেছে।

রাজকুমার কোলে করিয়া দেখাইল—রথে বামন চলিতেছেন—সে বামন দেখিলে আর পুনর্জন্মের ভয় নাই। ভক্তিগদগদ তার কণ্ঠ, শত সহস্র লোক ভক্তিতে নতি জানাইতেছে। আমিও প্রণাম করিলাম।

কিন্তু সে প্রণাম অনুভূতির মাধুর্য্যময়, একথা আজ বলিতে পারিব না। সকলে যাহা করে—তাহাই অনুকরণ করিলাম—। আজ বড় হইয়া ভাবি। মন্দিরে মন্দিরে তীর্থে তীর্থে এই যে জন সমারোহ—এই যে বারোয়ারি কাণ্ড—ইহা ত জীবন্ত ভাগবত বিশ্বাসের প্রতীক নয়। আমাদের দেশের সাধনার মাঝে যে মুক্তির সৌরভ ছিল—কোন্ পাপে তাহা শুধু আচার-সর্ব্বস্ব মিথ্যা প্রহসনে পর্যাবসিত হইল? কিন্তু সে কথা যাক্—রাজকুমারের কণ্ঠে ছিল ভাবের অস্পষ্ট মোহমদির মাধুর্য্য, আমি তাহার অমৃতরস আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইলাম।

দোকানের পর দোকান বসিয়াছে। কত যে নূতন নূতন জিনিষ আসিয়াছে, তাহার সীমা নাই। বিশু বৈরাগী বট তলায় ঝাঁপ বাঁধিয়া জিলাপি বানাইতেছে—গরম গরম জিলাপি কিনিয়া খাইলাম—রাজকুমার প্রসাদে বঞ্চিত হইল না। কাচের চুড়ির দোকানে মেয়েদের

ভিড়—সে দিকে না বাহির হইয়া পুতুলের দোকান হইতে ভাইটির জন্য ছুটি ঘোড়া কিনিলাম।

রাজকুমার বলিল, 'দাদা বাবু! একটা কেষ্ট ঠাউর কেনেন?' রাজ কুমারের কথা রাখিলাম না। ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ছিল না তাহা বলিতেছি না—কিন্তু সে বয়সে অচেনা ঠাকুরের চেয়ে চেনা, ঘোড়ার প্রতি ছিল অধিক মায়া।

তার উপর ঘোড়ার সাথে আছে গতির সম্বন্ধ—। রূপকথার পক্ষিরাজের মত তার অফুরন্ত উধাও গতি। কাজেই রাজকুমারের অনুরোধ না রাখিয়া ঘোড়া কিনিয়া লইলাম।

তারপর বাঁশীর দোকানে গিয়া ছুটি বাঁশী কিনিলাম, নিজের একটী, ভাইয়ের একটী। ভাই অশান্ত হইয়া উঠিতেছে, আমার বাঁশী দেখিলে কাঁদিয়াই অনর্থ করিবে।

রথের মেলা হইতে ফিরিয়া বারান্দায় বসিয়া মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতে লাগিলাম। টিনের জাপানী বাঁশী—কিন্তু তার দাম ত শুধু পয়সা নয়।

এই পৃথিবীর একান্ত চেনা সমস্ত তুচ্ছতাকে ছাইয়া যে অদৃশ্য কল্পলোক আছে, কবি ও মনীষীরা যার অনুভূতি পান—সেই অজ্ঞাত লোকের সুর এই ছোট বাঁশীটি বহিয়া আনে।

মণিদার বারান্দায় মণিদা বাঁশী বাজায়—আমাদের বারান্দায় আমি বাজাই।

সুরের সে কি মন-মাতানো খেলা। ছন্দ, তাল, মান জানিনা, রাগ রাগিণী জানি না—কিন্তু কত না ভঙ্গীতে, কত না রসে শিশুকণ্ঠের ধ্বনি-কলহ চলে।

মণিদা বলে, "দুয়ো, তোর বাজনা ঠিক হল না"

রাগিয়াছিলাম, বলিলাম "দুয়ো, তোমার বাজনা খারাপ—"

মণিদা দলে ভারি—তাহার দলের ছেলেরা তাহার জয়ধ্বনি করে—আমি আপন মনে একান্ত নিবিড় ধ্যানমগ্নতায় সুরলক্ষ্মীর অর্চ্চনা করি।

মা খাইতে ডাকেন, সে দিকে লক্ষ্য নাই। ঠাকুরদাদার ভয় দেখান, সে ভয়েও কম্পিত হই না। বাঁশী মনের মধ্যে যে আনন্দ আনিয়াছে, সে যে অপূর্ব্ব—সে যে অনন্ত।

কিন্তু অতর্কিতে বাঘ আসিল। ঠাকুরদা সত্যই বাঘ ছিলেন। এ যুগে তাঁদের মত মানুষ বোধ হয় আর জন্মে না। কণ্ঠ স্বর কি উদাত্ত! নির্ভীকতার অগ্নিশিখা তাঁর জীবনের চারিদিকে এমনই একটি জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করিত, যে লোকে ভয়ে ও শঙ্কায় তাঁর চরণে নত হইয়া পড়িত।

বাঘ বলিলেন, 'কাণ যে ঝালাপালা করলি, শালা!' এই বাঘের প্রচণ্ডতার মাঝেও একটুকু স্নেহ-সরস কোণ ছিল—আর সেই কোণে ছিল আমার আসন।

আনন্দ-বিভোর আমি কথা শুনি না—। বাঁশী বাজাইয়া চলি। বাঘের আগমনে বাড়ীতে সমস্ত শব্দ থমকিয়া যায়। গাছের পাতাও যেন ভয়ে ছম্ ছম্ করে—পাতাটি পড়ে না—বাতাস নড়ে না—। সমস্ত কল-কোলাহল থামিয়া যায়।

বাঘের বিবরে আজি এ কি অদ্ভুত বিস্ময়! বাঘ চুপ করিয়া রহিলেন—পরে বাঁশীটি কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। শান বাঁধানো মেঝেতে পাতলা টিন খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

ক্রোধে ও অভিমানে আমি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইলাম। তামাক রাখিবার জন্য ঠাকুরদা প্রয়াগ কি কাশী হইতে সুন্দর রঙীন একটি মাটির ভাঁড় আনিয়াছিলেন। আমাদের দেশের মত মাটি নয়—শক্ত মাটি, মনে হয় যেন পাথরে গড়া—রাগে সেই তাম্রকূট-ভাণ্ড আছাড় মারিয়া ফেলিলাম—সাধের ভাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

বাঘের ভয়ানক রাগ হইল। ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়াছেন—জল চৌকি, গামছা ও ঠনঠনিয়ার চটি গোছানোই ছিল—হাত মুখ ধুইয়া বুড়া চটি পায় দিতেছিলেন; ভাঙার শব্দ তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। 'তবেরে' বলিয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—বাঘের মত সে গর্জ্জন ভীম ও ভয়ঙ্কর।

হরিণ-শিশু যেমন করিয়া প্রাণ-ভয়ে ছুটিয়া পালায়, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া মৃত্যু ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে, আমিও তেমনই ছুটিলাম। পাশেই কাকাদের টিনের আট চালা—তাহার চারিদিক দিয়া ঘুরিতে লাগিলাম। ঠাকুরদাও পিছনে পিছনে ছুটিলেন।

তারপরে চলিল নবীন ও প্রবীণের শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমি ছুটিতেছি প্রাণ-ভয়ে—সে ভয় তরুণ সন্ধিতে আনে অমিত-বিক্রম। ঠাকুরদা পিছাইয়া পড়েন—হাঁপাইয়া মরেন। কিন্তু জেদী জেদ ছাড়েন না।

সেইদিনকার সেই ধাবন-লীলাকে ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না। বিশ্বের ছন্দে ছন্দে যে নৃত্য-রাগ ধ্বনিত হয়—এ যেন তারই অনুকৃতি—জরা ও উন্মেষের এ যেন মুখর সংগ্রাম।

মণিদা দৌড়িয়া গিয়া মাকে খবর দিল। মা ব্যাকুল নেত্রে এই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঠাকুরমা নাই—তাই তিনি কি করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

ঠাকুরমা দৈবাৎ আসিয়া পড়িলেন—বলিলেন, 'করছ কি ?'

'অজিতের বড্ড বাড় হয়েছে—ওর আজ একদিন কি আমার একদিন।'

"পাগল হয়েছ নাকি ?"

ঠাকুরদা হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন—"ও যে পাগলই ক'রে তুলেছে।"

আমি ভোঁ দৌড় দিয়া ব্যাকুলা জননীর বক্ষে আশ্রয় লইলাম।

শুনিলাম ঠাকুরমা বলিতেছেন—'বুড়ো হয়ে বাহাত্তুরে বুদ্ধি হচ্ছে দেখছি।'

ঠাকুরদা আসিয়া চুপ করিয়া বসিলেন। রাজকুমার তামাক সাজিয়া আনিল।

ভাত খাইয়া যখন ঘুমাইতে যাইব, তখন রাজকুমার বলিল, 'ঠাকুরদাদা ডাকছেন, দাদাবাবু।'

নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে রাজকুমারের কোলে চলিলাম। রাজকুমার অভয় দিল—বেগতিক দেখিলে সে চম্পট দিবে।

ঠাকুরদা তখনও তামাক টানিতেছেন, হুঁকো নামাইয়া বলিলেন, "কাঁদিসনে অজু, ফিরে রথে তোকে আমি ভাল বাঁশী কিনে দেবো।" আমার আহ্লাদ হইল, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করিয়া কোনও কথা বলিতে পারিলাম না।

ঠাকুরদা বলিলেন, 'যা ঘুমোগে—চিরকাল এমনি বীর হয়ে থাকিস, এমনই মাথা উঁচু করে থাকিস— তবেই অজিত নামের মান থাকবে।'

ঠাকুরদা হুঁকো তুলিয়া লইলেন। আমি নিঃশব্দ বিস্ময়ে ঘরে ফিরিলাম। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখের পরে সে দিন কি যেন কি অব্যক্ত স্বপ্ন জাগিতেছিল—। আশা ও আনন্দের সেই অস্ফুট অনুভূতি এখনও যেন এক একটুকু চেতনার আয়তনে পায়ের পরশ ফেলে।

৯

শরতের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাত। মধুমালতীর ফুলে মৌমাছিদের কলগুঞ্জন শোনা যাইতেছে। শ্যাম-সোহাগিনীর সাদা ও লালফুলে রঙীন প্রজাপতির মেলা বসিয়াছে। আউসের কাটা ক্ষেতে পায়রার ঝাঁক বসিয়াছে। দূরের শিশুগাছ হইতে পাখীর কলধ্বনি ভাসিয়া আসে।

প্রভাতের এই আনন্দ মেলার সঙ্গে, নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের দারিদ্র্য একান্ত বিসদৃশভাবেই অন্তরে প্রতিভাত হইতেছে। সঙ্গ ও সাহচর্য্য মানুষের একান্ত কাম্য ধন। মানুষ সামাজিক জীব। তার সংস্কৃতির পিছনে আছে তার সঙ্ঘশক্তি।

বিজ্ঞানের জয়-যাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। দিনে দিনে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়া দিকে দিকে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতেছে। কিন্তু মানুষের মনের দারিদ্র্য তাহাতে ঘুচিতেছে না। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নামিতেছে না।

সাধক বন্ধু বলিলেন—'যে প্রীতি অক্ষয়, সেই প্রীতিতেই ডুবে থাকুন—ভালবাসা বহির্মুখী না করে অন্তর্মুখী করুন।' কথাটা ভাবিয়াছি।

জগতের পিছনে যে অদৃশ্য মহাশক্তি আছে, তাহার সহিত প্রেমের সাধনা আমাদের বৈষ্ণব সাধকেরা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু এই অপরিচিত বৃহত্বে মন ভরে না।

আমাদের ছোট মন, সংসারের ছোট পরিধির মাঝে, সাথী খুঁজিয়া ফেরে—কাজের সাথী—ভাবের সাথী—দুঃখে দরদী, সুখে উল্লাসী। নির্ম্মম নিরাসক্ত হইয়া থাকা আমাদের পোষায় না।

আজ তাই বার বার করিয়া ছোট বয়সের সাথী সঞ্জয়ের কথা মনে পড়িতেছে। সঞ্জয় ও রূপলাল—দুজনে ছিল আমার রক্ষী সেনাপতি। সে এক মজার ইতিহাস।

ভাদ্রের বিপুল ধারায় আমাদের বাড়ীর পুকুর কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে। সেখানে মণি দাদা এবং আমি জলকেলি আরম্ভ করিয়াছিলাম। ডুব খেলা হইতেছিল। একটা গোল ছিল—সেখানে আশ্রয় লইয়া ডুব সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেই জিত। অপরে পথ পার হইবার আগে ছুঁইয়া দিলেই হার।

স্কুলে যাওয়ার বেলা ছাড়িয়া গিয়াছিল—কিন্তু খেলার উৎসবে আমরা উন্মত্ত হইয়া সকলই ভুলিতে বসিয়াছিলাম। এমনই যখন মাতামাতি, তখন মাষ্টার মশায় পথ দিয়া স্কুলে চলিতেছিলেন। ননী বাবু ছিলেন, আমাদের নীচের ক্লাসের ইংরেজি শিক্ষক। ক্লাসে অতি কঠোর—শাসনে অপ্রতিহত-প্রভাব।

আগমন মণিদার চোখে পড়িল! মনিদা বিলম্বিত একটি দাঁতনের শিকড় ধরিয়া ডুব দিয়া রহিল। আমিও ডুব দিলাম, কিন্তু অধিকক্ষণ ডুব দিয়া রহিতে পারিলাম না। যেই উঠিলাম, দেখিলাম ননী বাবুর শ্যেনদৃষ্টি আমার উপর পড়িয়াছে।

সে ১৩১৬ সালের ঝড়ের পর। ঝড়ে স্কুলের টিনের ঘর উড়িয়া গিয়াছিল। প্রতিষ্ঠাতাদের চণ্ডীমণ্ডপে কপোত কূজনের সঙ্গে ছাত্রদের কলকূজন মিশিত। ননী বাবু পড়ার ঘণ্টায় বলিলেন, "আজ কে কে সাঁতার দিচ্ছিল? কার কার চোখ রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল? সমস্ত ক্লাসে ভয় ও আতঙ্কের ঝড় বহিয়া যায়।

আমি উঠিয়া বলিলাম, 'মণিদা ও আমি ডুব সাঁতার খেলছিলাম, কিন্তু চোখ রাঙা হয়নি।' পাকা সাঁতারু মণিদাকে ননী বাবু দেখিতে পান নাই, তাই মণিদার উপর আক্রোশ পড়িল।

মণিদাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই আদেশ করিলেন—'হাই বেঞ্চের তলে বসে যা।'

মণিদা অপ্রস্তুত হইয়া, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া, আমতা আমতা করিতে লাগিল 'আজ্ঞে স্যার।'

'আজ্ঞে টাজ্ঞে নয়—একবারে বসে পড়ুন নচেৎ—' হাতের যষ্টি সঞ্চালনে বাক্যের পাদ পূরণ হইল।

আমার প্রতি তুল্য শাসন হইবে মনে করিয়া, আমিও সুড় সুড় করিয়া বেঞ্চের তলায় বসিয়া পড়িলাম।

মনিদার দিক হইতে যখন রক্তচক্ষু আমার দিকে ফিরিল, তখন তিনি কিন্তু আমাকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন "অজিত পালিয়েছে বুঝি?"

পাশে ছিল রূপলাল। সবল, বলিষ্ঠ ও নির্ভীক। সে বলিল "ও নিজেই শাস্তি নিয়েছে।"

ব্যাপারটিতে ননীবাবুর অধরেও হাসি ফুটিল। তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন 'পাকা দুষ্টু একেবারে—মণি হ'ল কাঁচা দুষ্টু, আর অজিত একেবারে পাকা দুষ্টু।'

আমার দুষ্টামি মোটেই পাকা ছিল না—তথাপি ননীবাবুর দেওয়া নামটি অনেকদিন বন্ধুমহলে বাঁচিয়াছিল। মহাকাল তাহাকে ধ্বংস করিয়াছে, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, যদি পুনরায় সেই দুষ্টামির মাঝে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম।

চারিদিকের আড়ষ্টতা মনকে যাঁতার মত পিষিয়া ধরে। কপটাচরণ বোধ হয় সভ্যতার ধর্ম্ম। মুখে এক প্রকার আর মনে অন্য প্রকার, আচরণের এই দ্বৈতস্ফূর্ত্তি, বোধ হয় আভিজাত্যের লক্ষণ। পারিনা—ক্লিষ্ট হইয়া উঠি। মনের সহজ গতিকে শাঠ্য ও কপটতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া বাহাদুরি নেওয়া ঘটিয়া ওঠে না—তাই মলিন মুখে তিক্ত হইয়া বসিয়া, জীবনের পরিসমাপ্তির দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি।

ননী বাবু চলিয়া গেলেন—তার পর বাধিল তুমুল সংগ্রাম। মণিদা মারমুখী হইয়া উঠিল, বলিল 'আমার নাম কেন বলে দিলি ?'

'বা! তুমিও ত সাঁতার দিয়েছ ?'

মণিদা রাগিয়া বলিল 'তাতে তোর কি হয়েছে ?'

আমার কিছুই হয়নি, তবু কেন যে বলিয়াছিলাম তার সদুত্তর সেদিন অনুভূতির ছিল। তাই সেটাকে খোলসা করিয়া বুঝাইতে পারি নাই—বলিলাম—"সত্যি কথা যে—" মণিদা বলিল 'সত্যি হল ত বয়ে গেছে—তুই না বললে ত' আর শাস্তি হ'ত না।'

সত্যের প্রতি যে মমত্ব-বুদ্ধি মণিদাকে শত্রু করিয়া তুলিয়াছে, জীবন যাত্রার পদে পদে তার পরিচয় পাইয়াছি। মণিদাদার মতই সংসারের লোক, সত্য বাক্যের ও সত্য প্রকাশের মর্ম্ম বোঝে না।

মিথ্যা ও ফাঁকিরই জয় জয়কার, সেখানে সত্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া লাভ নাই। ছল ও চাতুরী জয়ের পন্থা—সেটাকে যে ভুলিবে সে পদে পদে হারিবে।

তাকে যারা মানে, তারা একান্তই বোকা, একান্তই ভাব বিলাসী—একান্তই কাব্য জগতের। সংসারের পিচ্ছিল পথে অকপটতার স্থান নাই।

কথায় কথা বাড়িয়া চলে। মণিদা ও আমার সেই কলহ-গর্ব্ব শেষ হইল রেষারেষিতে। মণিদা বলিল 'তোকে জব্দ করব—দেখি কে ঠেকায়?'

বিপদের সেই কাল দুর্য্যোগে বিদ্যুতের রেখা উদ্ভাসিত হইল—রূপলাল ও সঞ্জয়ের কথায়। রূপলাল বলিল—"ভয় নেই ভাই—আমরা থাকতে তোকে কেউ মারতে পারবে না।'

নিরঙ্কুশ নির্ভীক বাণী। মণিদা এতটুকু হইয়া গেল—বলিল 'তুমি কেন ওকে ঠেকাবে?'

সঞ্জয় উত্তর দিল—'শুধু রূপলাল নয়—আমিও দেখব।'

মণিদা চুপ করিয়া গেল—সঞ্জয় ছিল জাতিতে পুণ্ড্রীক। বৈরাগীর ঘাটের ওপরে ওদের বাড়ী। গাঁয়ের হাটে ওর বাপ লঙ্কা হলুদ ইত্যাদি বেচিত। বড় হইয়া জানিয়াছি যে ওরা তথাকথিত ধর্ম্ম-ধ্বজীদের বিচারে জল-অচল। কিন্তু সে বিষয়ে তখন জ্ঞান হয়নি—তাই তার উদার বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ হয় নি। আর বড় হইয়াও এই তত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই।

ব্যাখ্যা শুনিয়াছি অনেক, কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই। মানুষকে ঘৃণা করার প্রতিফল, প্রতি পদে পদে অনুভব করিতেছি, তবু চৈতন্যোদয়ের কোনও চিহ্নই নাই। বিরাট পুরুষের কর চরণ প্রভৃতি নানা জাতি, তাই যদি সত্য বলিয়া ধর্ম্মধ্বজীরা মনে রাখিতেন, তাহা হইলেও হয়ত সমস্যার পূরণ হইত। কারণ বিধাতা পুরুষের কোনও অঙ্গই হেলার নয়, অবজ্ঞার নয়। কিন্তু একথা বলিয়া তর্ক করা অন্যায়, কারণ আমাদের শাস্ত্র অনন্ত—তার ব্যাখ্যাও অনন্ত, আর যদি না মানি, তাহা হইলে শাস্ত্রই হোক, আর যুক্তিই হোক, কিছুরই

বালাই নাই। জীবে ও শিবে অভেদ বুদ্ধি আমাদের ধর্ম্ম সাধনার মর্ম্ম কথা—ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমত্ব বুদ্ধি আমাদের বিরাট আদর্শ—কিন্তু যে জাতি প্রাণহীন, তার ধর্ম্ম ত প্রকাশের নয়, তার ধর্ম্ম সঙ্কোচের।

ব্যাপ্তি ও বিকাশ প্রাণের পরিচয়। গতি তার ছন্দ! আড়ষ্টতা ও অবশতা মৃত্যুর সঙ্গী—আমরা মরিতে বসিয়াছি—তাই গতিকে ও প্রসারণকে কিছুতেই আমরা মানিতে পারি না এবং মানি না

সঞ্জয়ের বীরত্বব্যঞ্জক কথা মণিদাকে ভড়কাইয়া দিল তবুও সে পথে আসিয়া ঝগড়া বাধাইল।—রূপলাল ও সঞ্জয়ের জন্য মণিদা কিছুই করিতে পারিল না। সঞ্জয়ের বাড়ী ছিল আমাদের বাড়ীর কাছে; তাই তার সাথে মিতালি বাড়িয়া চলিল।

মাটীর ধরার সঙ্গে সঞ্জয়ের বিচিত্র পরিচয় ছিল। তাই তার মিতালির ফলে অনেক অজানা রহস্য আমার জানা হইল। ওদের বাড়ীর পাশেই ছিল নদী।

গতির এই জীবন্ত প্রতিমা ওদের অন্তর ভুলায়। নদীকে তাই ওরা ভয় করিত না—ঋতুর তালে তালে, দিনের গতি ভঙ্গে, নদীর যে বিভিন্ন ছবি ফোটে—তার সাথে ওদের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগ। সঞ্জয় বলিল 'যাবি অজিত মাছ ধরতে?'

ছুটির দিন। তাই লোভ হইল। মাকে বলিলে অনুমতি হয়ত পাইব না, তাই ঠাকুরমাকে বলিলাম 'সঞ্জয়ের বাড়ী যাচ্ছি ঠাকুমা!' ঠাকুরমা ছিলেন পূজায় ব্যস্ত। উত্তর দিলেন না। মৌনই সম্মতির লক্ষণ, মনে করিয়া আমিও বিদায় লইলাম।

সঞ্জয়ের মা মুড়ি ভাজিতেছিলেন। গরম গরম মুড়ি ছোট ধামিতে লইয়া, লঙ্কা ও তেল সংযোগে চর্ব্বণ করিতে করিতে ডিঙ্গিতে চড়িলাম।

সঞ্জয় চার পাঁচটা ছিপ নিল, তারপর 'বটে' হাতে মাঝি হইয়া বসিল। সঞ্জয় ডিঙ্গি চালাইতে জানে—জলের গতিকে অশ্রদ্ধা করিয়া সে হাতের কৌশলের জয় ঘোষণা করিতে জানে।

এতদিন নৌকা চড়িয়াছি যাত্রী হিসাবে। সেখানে কাজ স্থাণুর মত অচল হইয়া বসিয়া থাকা, আর আজ নিজে চালক। আমার অন্তর অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিল।

জল তার জোয়ার ভাঁটার ধারা নিয়া আপন মনে বহিয়া চলে। সে বাধা মানিতে চায় না—কিন্তু মানুষ তার গতিকে উপেক্ষা করিয়া পারের সন্ধানে চলে।

ডিঙ্গি বহিয়া চলে। আমিও 'বটে' লইয়া চালাইবার কসরৎ শিখি। কূলে দাঁড়াইয়া দেখি নদীর যে রূপ, সে রূপ ত নদীর সত্যকার নয়। বাঁকে বাঁকে, ফাঁকে ফাঁকে, নদীর সে কি বিচিত্র নৃত্যদোদুল ছন্দচটুল লাবণ্য, কোথাও সে কুলু কুলু করে মন্থর অলস গতি, কোথাও সে উচ্ছল উন্মাদ। কোথাও হোগলার বনে সে সুড় সুড় করিয়া খেলা করে, কোথাও 'ঘোলা' তৈরি করিয়া সে বজ্রগর্জ্জন তোলে। কোথাও বাঁশ ঝাড়ের তলে তার নীরব অলস যাত্রা—কোথাও সে ব্যগ্র ব্যাকুল অধীর অশান্ত।

যাত্রী হইয়া নদীর এই লীলাচঞ্চল রূপ চোখে পড়ে নাই। সঞ্জয় আজ বিজয়ী অভিযানকারীর মত নদীর এই নানারূপ ও নানা বিলাসের খেলা দেখাইয়া চলিল।

আমিও 'বটের' আঘাতে নদীর এই গতি-সুন্দর স্পর্শ পাইলাম। প্রকৃতির সঙ্গে সে কি সুনিবিড় যোগ।

ডিঙ্গি ভিড়িল দূরবিসারী মাঠের মাঝে 'চলন-বিলে'। খালের পাশের বাদাম গাছে নৌকা বাঁধিয়া বিলে ছিপ ফেলিয়া বসিলাম। মাছ আগে ধরি নাই। মাছ ধরিতে তাই অশেষ কৌতুক ও আনন্দ হইল।

কিন্তু খেলার চেয়েও চলন-বিলের সেই বিরাট বিস্তৃতি আমাকে মুগ্ধ করিল। যেদিকে চাই, সেদিকে ধানের ক্ষেতের সবুজ শ্যামাভা দিগন্তে মেঘের রঙের সাথে মিশিয়াছে। আতাইয়ের বাঁক সেই শ্যামাভার মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে পালের নৌকা আসে তাহাতেই নদীর পরিচয় পাই।

শিশুমনে ভূমার এই অতলস্পর্শ বোধ যে কি চমৎকার ছিল—আজ তাহা বোধ হয় ভাষায় বুঝাইতে পারি না। বয়সের গতির সঙ্গে স্বর্গছবি মানুষের নিকট হইতে দূরতর হইয়া যায়। অপরিণত চিত্তে ভূমা যে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার জাগাইয়াছিল, তার মাধুর্য্যে যেন কাল-সাগর পাড়ি দিয়া আজও অন্তরে জাগে। চলন-বিলের সেই ছবি, আজও যেন তাই একান্ত সমুজ্জ্বল হইয়া অন্তরে জাগ্রত আছে।

পুঁটি, চিংড়ি, কৈ, খলিসা, শোল অনেক মাছ পড়িল। সঞ্জয় এই সব মাছের বিভিন্ন চাল-চলন, আমাকে সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছিল। পুঁটি মাছ পট্ পট্ পড়ে—ফাতনার নাচন আরম্ভ হইলেই টান দিতে হয়। একবার টান দিতেই ফাতনা একটী বিলেন গাছে আটকাইয়া গেল—জলে নামিয়া কৌশল করিয়া ছাড়াইতে গিয়া অনেক দেরী হইল।

হঠাৎ পায়ে কি যেন সুড় সুড় করিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি কালো ও হলুদের ডোরা দেওয়া সাপ—আতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠিলাম।

সঞ্জয় দৌড়িয়া আসিল—সাপ পা পেঁচাইয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল। প্রাণ-ভয়ে জল হইতে বেগে উঠিয়া পড়িলাম, কিন্তু সাপ পা ছাড়িল না।

সঞ্জয় আসিয়া সাহস করিয়া সাপের মুখ চাপিয়া ধরিয়া পা হইতে ছাড়াইয়া ফেলিল। তারপর তাচ্ছিল্য করিয়া বলিল—'ও জল বুড়ো সাপ, ওর বিষ নেই।'

কিন্তু সঞ্জয়ের আশ্বাস আমাকে একটুকুও আশ্বস্ত করিল না। সাপটি পায়ে কামড় দিয়াছিল—সেখান হইতে রক্ত পড়িতেছিল। আমি অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাই দেখাইয়া দিলাম। বলিলাম 'আমি আর বাঁচব না ভাই—আমায় বাড়ী নিয়ে চল।'

'নারে অজিত, কোনই ভয় নেই—আমি ধূলো পড়া জানি'—এই বলিয়া খানিকটা ধূলা লইয়া বিড় বিড় করিয়া কি মন্ত্র পড়িয়া পায়ে লাগাইয়া দিল।

কিন্তু আমার কান্না থামিল না। সঞ্জয় তখন ছোট শিশুর মত আমাকে কোলে করিয়া ডিঙ্গিতে তুলিল—তারপর প্রাণপণে নৌকা চালাইল।

নৌকা চলিল তীর বেগে। আকাশে ও বাতাসে তখনও আনন্দোৎসব, কিন্তু আমার কানে তখন ভয়ে ও আতঙ্কে যেন মৃত্যুর ডম্বরুধ্বনি বাজিতেছিল।

সঞ্জয় আশ্বাস দিল "ভয় নেই—কিছুই হবে না—আমার মার কাছে বিষ-পাথর আছে—তা দিয়ে দেখবি, বিষ লাগে নাই।"

আমি এলাইয়া পড়িয়া রহিলাম। শঙ্কা ও উদ্বেগের অন্ত নাই। আমি বলিলাম—'ভাই সঞ্জয় কি হবে? আমার পা যে অবশ হয়ে আসছে?' সঞ্জয়ের হয়ত ক্ষণেকের জন্য ভয় হইল। সে কথা না

বলিয়া আপন কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। আমার পায়ে শক্ত করিয়া বাঁধন দিয়া বলিল 'কিছু ভয় নেই।'

ভয় নাই বলিলে, যদি ভয় যাইত, তাহা হইলে জগতে ভীরু কাপুরুষের স্থান থাকিত না। জানি না কেন এবং কি জন্য মৃত্যুকে এত ভয় করি? জীবনের প্রতি প্রীতি কি মৃত্যু ভয়ের কারণ?

ডিঙ্গি ভিড়িল—সঞ্জয়ের রান্না ঘরের পাশে খিড়কির ঘাটে। সঞ্জয় ডাকিল 'মা!'

সঞ্জয়ের মা আসিলেন, দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি মাছ পেলিরে?' 'মাছ পেয়েছিলাম অনেক, তা আনিনি মা, তুমি তাড়াতাড়ি বিষপাথরটা নিয়ে এস—অজিতের পায়ে সাপে কামড় দিয়েছে? সঞ্জয়ের মা বিষ-পাথর আনিলেন। বলিলেন 'কি সাপ?' মার আশ্রয়ে সঞ্জয়ের সাহস ফিরিল—"সে জলবুড়ো সাপ, মা!—তার বিষ নেই—অজিত ভয়েই এলিয়ে পড়েছে"—সঞ্জয়ের মা বলিলেন—'ভয় নেই বাবা!—কিছুই হয়নি—আমি পাতা বেটে ঔষধ দিচ্ছি—সব সেরে যাবে।'

সঞ্জয়ের মায়ের আশ্বাস আমার মনে অনেক বল সঞ্চার করিল।

সঞ্জয়ের মা পাতা বাঁটিয়া দিলেন—আমি উঠিয়া বলিলাম।

সঞ্জয়ের মা দুধ আনিয়া দিলেন। দুধ খাইয়া সঞ্জয়ের সঙ্গে বাড়ী ফিরিলাম।

বিষ লাগে নাই বটে, কিন্তু চলন-বিলের রৌদ্র আর আতঙ্ক আমকে কাতর করিয়া ফেলিল।

বাড়ী যখন ফিরিলাম তখন আমার চোখ মুখ লাল হইয়াছে—শরীরে কম্পন ধরিয়াছে!

মা বকিতে সুরু করিবেন, এমন সময় ছল ছল চোখ দেখিয়া বলিলেন 'তোর কি জ্বর এসেছে ?'

আমি কোনও প্রকারে উত্তর দিলাম—'ভয়ঙ্কর জ্বর মা।'

বকুনি আর হইল না। বিছানা লইলাম। এই আতঙ্ক-জ্বর আট দশ দিন ছিল।

প্রত্যেক দিন সঞ্জয় আসিয়া খবর নিত। কাঁচা পেয়ারা পাড়িয়া আনিত। শিয়রে বসিয়া আশ্বাস দিত 'কোনও ভয় নেই ভাই।'

সঞ্জয়ের মনে মনে কষ্ট ছিল যে তার জন্যই আমার ভোগ। তাই সে আমার সেবার জন্য একান্ত ব্যস্ত ছিল।

সঞ্জয় আসিয়া বলিল 'ভয় নেই অজু, কাল আমি মনসামায়ের কাছে ঘট মানত করেছি, আর স্বপ্ন পেয়েছি তুই ভাল হয়ে যাবি!'

কি আগ্রহ ভরা স্বর। এই অক্ষয় অবিনশ্বর প্রীতির কথা ভুলিবার নয়। ভাল হইয়া উঠিলাম।

তারপর অনেক দিন গিয়াছে। জীবনের ডাক দূর দূরান্তরে নিয়া আসিয়াছে। সঞ্জয় বাঁচিয়া আছে—অজিতও বাঁচিয়া আছে কিন্তু মিলনের সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পথ-চলার মাঝে হয়ত আর দেখা হইবে না—তবু সেদিন যাহা পাইয়াছি, তাহার জন্য মানুষকে ধন্যবাদ দেই। মানুষের মাঝে বিষ আছে, সেকথা আজ পদে পদে বুঝিতেছি। আজ বিপদের দিনে তেমন করিয়া আর ত কেহ বলে না। 'কোনও ভয় নেই ভাই।'

মানুষে মানুষে বিরোধ, ও অসম্প্রীতি বাড়িতেছে। বাড়ুক, কিন্তু যতদিন সঞ্জয়ের কথা ভুলিব না, ততদিন মানুষের প্রীতিকে অস্বীকার করিতে পারিব না। মানুষ সয়তান সত্য, আবার মানুষও দেবতা। শিশু-দেবতা সঞ্জয় তার ত্যাগ ও প্রীতি দিয়া একথা আমাকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিল।

গাঁয়ের ইংরাজি স্কুল নদীর ধারে। ভৈরব ও আতাই যেখানে ত্রিমোহানা রচনা করিয়াছে, তারই পাশে স্কুলের বাড়ী। নদীর চর সেখান হইতে চরের হাটে মিশিয়াছে।

ঝড় শেষ হইয়াছে, আবার নদীতীরে স্কুলের ঘর উঠিয়াছে। নদীতীরে পড়িতে পড়িতে, নদী মনের মাঝে কি যেন এক অপূর্ব্ব মোহ বিস্তার করিয়াছিল।

ক্লাশের ঘণ্টার মাঝে, কারণে অকারণে ছুটি চাহিয়া বাহিরে আসিতাম। সেদিন ননীবাবুর ঘণ্টা—তিনি কাঁচা দুষ্টু ও পাকা দুষ্টুকে শাসন করিতে অদ্বিতীয়, কিন্তু তবুও তাকে ফাঁকি দিতে পারিতাম।

ননীবাবুর বাহির ছিল, ইক্ষুর মত শক্ত, কিন্তু ভিতর ছিল সরস। তাই গাঁয়ের থিয়েটারে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে অভিনয় করিতে পারিতেন।

সেই অভিনয়ের দৃশ্য আজিও যেন চোখে ভাসে। গাঁয়ের জমিদার বাড়ী পূজার তিন রাত্রি অভিনয় হইত।

নিজের বাড়ীর পূজা ফেলিয়া সেখানে আমার যাওয়া চাইই; সন্ধ্যা হইতে খাওয়া শেষ করিয়া থিয়েটারের সম্মুখে দল বাঁধিয়া সে কি অধীর প্রতীক্ষা।

বধির যবনিকা কথা শোনে না। আমাদের অন্তরের আকুল আবেদনেও সে নড়িত না। রাত অনেক হইলেই ধীরে ধীরে যবনিকা তুলিত। হরিশ্চন্দ্রের অভিনয়ে ননীবাবু সাজিতেন হরিশ্চন্দ্র। যবনিকা উঠিল—দেখা গেল বিশ্বামিত্র অগ্নি জ্বালিয়া তপস্যা করিতেছেন, আর তিনটী আর্ত্ত মহিলা মৃত্যুভয়ে কাঁদিতেছেন।

রঙ্গমঞ্চে বিশ্বামিত্রের এই সাগ্নিক তপস্যা আমাদের অন্তরে অত্যন্ত সাড়া দিত। দৃশ্য সজ্জার এই কৌশল আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তাই অত্যন্ত বিস্ময়ে আমরা বিশ্বামিত্রের এই প্রচণ্ড অগ্নিমধ্য তপস্যাকে দেখিতাম।

বিপদ যখন আসন্ন—ক্রন্দন যখন শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে, তখন সহসা আসিতেন হরিশ্চন্দ্র—আর্ত্তের রক্ষক—দীন প্রতিপালক। ক্রোধীর সহিত ক্ষত্রবীরের এই ভাবসংগ্রাম, অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী—। তাই হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে আমরা ননীবাবুকেও উচ্চ মনে করিয়া শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতাম।

তার পরদিন পৃথ্বীরাজের অভিনয় হইত। তিনি সাজিতেন পৃথ্বীরাজ! রাজসূয় যজ্ঞ হইতে সংযুক্তাকে অপহরণ—আমাদের নিকট অত্যন্ত গরিমাময় মনে হইত।

ননীবাবু তাই শুধু শিক্ষক ছিলেন না—তাঁর সাথে আমাদের ছোট বয়সের মহত্ত্বের ও গৌরবের অনেক ধারণা জড়িত ছিল। ননীবাবুর ক্লাসে সেদিন মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিলাম—'আজ্ঞে স্যার!' স্কুলের প্রথম ঘণ্টা—ক্লাশও বেশীক্ষণ বসে নাই----কাজেই ছুটি লওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনই কারণ নাই। কিন্তু সেদিন তার মনটি হয়ত সুপ্রসন্ন ছিল----তাই প্রশ্নোত্তরের পালা হইতে অব্যাহতি দিয়া বলিলেন----'যাও'

বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখি নন্দনপুর ও চন্দনীমহালের ছেলেরা খেয়ায় পার হইতেছে—আর আতাই দিয়া আসিতেছে ষ্টীমার। তথায় নৌকা ষ্টীমারের ধারে ধারে গিয়া পড়িয়াছে। দাঁড়াইয়া রহিলাম, ভাবিলাম খেয়া নৌকার নাচন দেখাটা মন্দ কাজ হইবে না। তরঙ্গের দোলায় দোলায় নৌকা নাচিবে,—মাঝি কৌশলে নৌকা বাঁচাইবে,—সেটা দেখিতে অত্যন্ত মজা হইবে।

কিন্তু মজা দেখিলাম অন্য রকম। ষ্টীমার হঠাৎ খেয়ার উপর আসিয়া পড়িল—আর ভরা খেয়া ডুবিয়া গেল।

ভয়ে ও আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ননীবাবু বাহিরে আসিলেন। তারপর জলদগম্ভীর স্বরে হাঁক দিলেন—ছেলেরা বাহির হইয়া আসিল। স্কুলের ঘাটে ডিঙ্গি বাঁধা ছিল। তাই নিয়া ননীবাবু ও ছেলের দল বাহির হইয়া পড়িলেন।

ষ্টীমার থামিল। ডোবা ছেলেদের কেহ কেহ সাঁতার দিয়া কূলে আসিল—কেহ কেহ জেলে ডিঙ্গিতে চড়িল—কেহ কেহ স্কুলের ছেলেদের ডিঙ্গিতে চড়িল। ননীবাবু ষ্টীমারে চড়িয়া সারেঙ্গের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দিলেন।

ঝগড়া থামিতে না থামিতে ননীবাবুকে নামাইয়া না দিয়া ষ্টীমার খুলনা রওনা হইল। পরে শুনিয়াছিলাম কোম্পানীর বড় সাহেব সারেঙ্গকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ননীবাবু সারেঙ্গকে বলিয়াছিলেন, যে সকল ছেলেদের তুলিয়া কূলে নামাইয়া দিয়া যাইতে হইবে। সারেঙ্গ তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। এই অমানুষিকতার জন্য সারেঙ্গ শেষে পদচ্যুত হইয়াছিল।

ননীবাবু স্কুলে ফিরিলেন রণবিজয়ী বীরের মত। সেদিন আর পড়াশোনা হইল না। মৃত্যুর স্পর্শ আসিয়াছিল—কিন্তু তাহার তুহিন শীতলতা স্নেহের ও প্রেমের উষ্ণ তাপে গলিয়া গেল।

সে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। ছোট ছেলেদের ডাকিয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলাম----'তোদের কেমন মনে হচ্ছে রে?' 'কিচ্ছু ভয় লাগেনি ত? তাহারা উত্তর দিল "কিছু না' ভেবেছিলাম সাঁতার দিয়ে পার হবো!' সেকথা সত্য নহে। সে তাদের বড়াই। কিন্তু

মৃত্যুকে মানুষ জয় করিয়াছে—ভয়কে সে মানে নাই—এই আনন্দ সেদিন সমস্ত অন্তর পূর্ণ করিয়া রাখিল।

মৃত্যু চির রহস্যময়। জ্ঞানী ও গুণী তার অন্ধকার-যবনিকা সরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তিমির যবনিকা আজিও বধির।

কিন্তু সে ভাবনা করিবার বয়স নহে। কলহাস্যে পথমুখর করিয়া বাড়ীতে ফিরিলাম। কিন্তু উচ্ছ্বসিত আনন্দের আতিশয্য প্রকাশে বাধা হইল—ঠাকুরমা বলিলেন—'দাপাদাপি করিস্‌নে অজু'

'কেন? আজ যে খুব মজা হয়েছে ঠাকুমা!'

'কি মজা?'

'ত্রিমোহনায় খেয়া নৌকা ডুবে গিয়েছিল!'

'সবাই বেঁচে গেছে?'

'গেছে কিন্তু সে এক মজার কাহিনী—'

'থাক আর এক সময় শুনব—আজ চেঁচামেচি করিসনে, তোর ঠাকুর-দাদার অসুখ করেছে।'

ঠাকুরদাদার অসুখ অন্তরকে বিষণ্ণ করিল না। বরং নৌকাডুবির সরস ও বাক্যবহুল বর্ণনা করিতে পারিলাম না বলিয়া মন অত্যন্ত মুসড়িয়া গেল। যে ভাবের লাভাপ্রবাহ বাহির হইবার জন্য, উৎসুক আগ্রহে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল—তাহাকে থামাইয়া রাখিবার বেদনা অসীম।

কবির প্রকাশ বেদনা এমনই অসহ। বিস্ময়রসে যখন মন ভরিয়া ওঠে, তখন অব্যক্ত ব্যক্ত হইতে চাহে। এই ত সত্যকার সৃষ্টি।

বিমূঢ় ব্যথিত মুখে কি করিব ভাবিতেছি—এমন সময় ঠাকুরদাদার ক্ষীণকণ্ঠ শুনিলাম, 'অজিত এখানে আয়!'

সে স্বর কি করুণ! কি কোমল, কি দরদ-ভরা! ঠাকুর দাদা ছিলেন সিংহ-বিক্রম পুরুষ। কোনও দিন অসুখ তাহার হয় নাই, দীর্ঘ্যবস্তু তাঁর আবহাওয়াই ছিল বজ্রকঠোর। সমস্ত আবরণের মাঝে ছিল একটা দুঃসহ শক্তির তাপ।

তাই এ কোমল আকুতি আমাকে অত্যন্ত খুসী করিল। আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলাম—'কি দাদু!'

'আয় আমার কাছে বসবি?'

তাঁর বজ্রদৃঢ় অন্তরে আজ একি পরিবর্ত্তন। যে চিত্ত সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে, আপন উচ্চ চূড় কোনও দিন অবনমিত করে নাই—উদাসীন দূরত্বে আপন মহিমায় শুধু উজ্জ্বল ছিল, আজ তাহার মধ্যে সঙ্গ ও সান্ত্বনার কামনা বেসুরা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ বিচার করিবার বয়স তখন নয়, আমি ঠাকুরদাদার রোগশয্যায় গিয়া বসিলাম, ধীরে ধীরে তাঁর কপোলে হাত বুলাইতে লাগিলাম।

ঠাকুরদাদা বলিতে লাগিলেন 'কি বলছিস্‌রে অজু!"

'মোহনায় নোকাডুবি হয়েছে—!'

প্রশ্ন হইল 'কেমন করে রে?' কৌতুহল ও ব্যগ্রতা একটু অস্বাভাবিক, বলিলাম—'স্কুলের ছেলেরা পার হয়ে আস্‌ছিল—স্কুলের ঘণ্টা তখন পড়ে গেছে তাই নৌকা জোরে বইছিল—আমি নাক ঝাড়তে বাইরে এসে দেখতে পেলাম!'

'তুই বুঝি বারে বারে বাইরে আসিস্‌?'

'বারে বারে নয়।' 'তবে মাঝে মাঝে আসি।'

'ফাঁকি দিস্‌নে রে অজু—ভাল ক'রে মন দিয়ে পড়লে, পণ্ডিত হতে পারবি—'

'যা বলছিলাম দাদু শোনো।'

'আচ্ছা বল।'

'নড়াইল থেকে ষ্টীমার আসছিল—ষ্টীমারও খুব জোরে আসছে—নৌকাও খুব জোরে চলছে —গেছে ধাক্কা লেগে……'

'তারপর ?

'নৌকা গেল ডুবে—ছেলেরা সব সাঁতার জানত, তাই বেঁচে গেছে—

ঠাকুরদা আমার প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা আমি যদি মরে যাই ?

'না দাদু, তুমি মরবে কেন ?

'কাউকে বলিস্‌নে অজু—কিন্তু আমি আর বাঁচব না—'

তারপর আমার মুখের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন 'ছি কাঁদতে নেই আমি তোকে ঠাট্টা করছি, 'যা খেলা করতে যা।'

খেলা করিতে চলিয়া গেলাম—কিন্তু সেই স্বর—সেই শঙ্কা আমার সমস্ত মনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। মণিদাদারা ডাংগুলি খেলিতেছিল। খেলার মধ্যে আমারও ডাক পড়িল। কিন্তু সেদিন খেলায় মন জমিতেছিল না।

খেলা শেষে শ্রান্ত হইয়া যখন বটতলার ছায়ে বিশ্রাম করিতেছি তখন মণিদাদাকে প্রশ্ন করিলাম 'মণিদা! মানুষ মরলে কি হয় ?'

যে প্রশ্ন চিরকাল মানুষের মনে ভয় ও শঙ্কা জাগায়—যার উত্তর মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান জানে না, মণিদার তাহা নিশ্চয়ই জানা ছিল না, কিন্তু যে বয়স, সে বয়স অসম্ভবকে জানে না—অসম্ভবকে মানে না। মণিদা অম্লান বদনে বলিল 'যারা ভাল তারা স্বর্গে যায়, আর যারা খারাপ তারা মরে ভূত হয়।'

সে উত্তরে সংশয় নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার তার আলোছায়ার ঝিলি-মিলি লইয়া, বটের পাতায় মিছিল বসাইয়াছে। ভূতের কথায় গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া ওঠে। মনে হয় গাছের ছায়ায় ভূতেরা তাদের জল্‌জ্বলে চোখ মেলে!

ভূতের কথা ভুলিবার জন্য বলিলাম 'আচ্ছা মণিদা স্বর্গ কোথায়?'

'তাই আর জানিস্‌নে? আগে বৈতরণী নদী পার হতে হয়—তার-পর যমের বাড়ী—যম বসে বিচার করেন—যারা পুণ্য করে, তারা যায় স্বর্গে, আর যারা পাপী, তারা যায় নরকে।'

'তাহলে ভুত হয় কারা?'

মণিদা সমস্যায় পড়িল। ভুতের কুলজী জানা তাহার নাই, কিন্তু ঠকিয়া যাওয়া ঠিক নয়, মণিদা তাই হাসিতে হাসিতে বলিল 'যারা বৈতরণী পার হতে পারে না, তারাই ভূত হয়।'

আমি বলি 'মণিদা! তুমি ভূত দেখেছ?'

'দেখিনি—তবে তোদের ঐ যে বড় আম গাছ—তাতে 'এলো' আছে। সেবার শেষ রাতে পাকা আম গিয়েছি কুড়োতে—দেখি, দপ দপ করে জ্বল্‌ছে—'

আলেয়াকে লোকে বলে 'এলো'; পেত্নীরা যখন মুখ হাঁ করে, তখন এলো জ্বলে—সে গল্প শুনিয়াছি।

শঙ্কা-দোদুল চিত্তে বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ীর আবহাওয়ার মধ্যে যেন অস্বস্তিকর নিঃশব্দতা। ঠাকুর দাদা সত্যই কর্ত্তা ছিলেন। পুত্র কলত্রাদি পরিবৃত সেই বৃহৎ পরিবারের সমস্ত আয়োজন ও প্রয়োজনের তিনিই ছিলেন মূলাধার।

কথা হইল ঠাকুরদাকে চিকিৎসার জন্য সহরে যাইতে হইবে। ঠাকুরমা বলিলেন 'যাবি অজু।'

দিনে দিনে ঠাকুরদা আমার সঙ্গকে অত্যন্ত আরামজনক বলিয়া মনে করিতেছিলেন। শঙ্কাকুলা ঠাকুরমার আহ্বানের ছিল এই তাগিদ।

আমার অসম্মতি হইল না। সহরের অনতিপরিচিত রূপের মধ্যে একটা যাদু ছিল, তাই আনন্দেই সঙ্গে চলিলাম। বাবা তখন সহরে সদ্য ওকালতি সুরু করিয়াছেন। বাবার জন্য ঠাকুরদা এই বাসা কিনিয়াছিলেন।

সহরের মধ্যে হইলেও বাসাটী নানারকম গাছ-পালায় ভরা। আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, আমড়া, আতা প্রভৃতি অসংখ্য ফলের গাছ। পড়ার বইয়ের অত্যাচার ভুলিয়া, আমি পক্ক ফলভরা এই সমস্ত বৃক্ষদের সাহচর্য্যের মাঝে অত্যন্ত আনন্দ খুঁজিয়া পাইলাম।

কিন্তু ঠাকুরদাদা কিছুতেই ভাল হইলেন না।ঠাকুরমাকে লুকাইয়া আমি ঠাকুরদাকে কাঁচা মিঠে আম খাওয়াইতাম। কোনও দিন বা আধ পাকা আম আনিয়া, বৃদ্ধ ও আমি পরম পরিতোষ লাভ করিতাম।

ঠাকুরদা সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে তাকাইয়া বলিতেন—'তোর ঠাকুরমাকে বলিস্ নে অজিত!'

'না, বলবো না, তুমি খাও দাদু!'

যে চাপল্য রুদ্ধ ছিল, মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া সে বিজলীর মত ক্ষণিক খেলা দেখাইয়া গেল, তাই এই সব তুচ্ছ কথা স্মৃতির পাতায় একেবারে গাঁথিয়া গেছে।

ঠাকুরদা বলিলেন 'অজিত চল বাড়ী যাই—আমার ভাল লাগছে না—'

'ঠাকুমাকে বলি।'

'বল'

ঠাকুমাকে ঠাকুরদাদার ইচ্ছার কথা বলিলাম। ঠাকুরমা ঠাকুরদাকে সহরে থাকিবার জন্য অনুনয় করিলেন—কিন্তু তিনি পর্ব্বতের মত অচল। সেই পুরাতন অস্বীকার-অসহিষ্ণু তীক্ষ্ণতায় বলিলেন 'বাড়ী যাবো।'

ঠাকুরমা কি যেন বুঝিলেন—উদ্গত অশ্রু থামাইয়া বলিলেন—'তবে চলো।'

বাড়ী আসিলে আত্মীয় স্বজনের যাতায়াতের ভিড় জমিল। মরণ-পথ-যাত্রীকে প্রীতি ও ভক্তির শেষ অর্ঘ্য দিবার জন্য, দলে দলে লোক আসিয়া মহা সমারোহ করিয়া তুলিল। পিসীমারা আসিয়া ভিড় করিলেন। কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিয়া তুলিলেন।

ঠাকুরমা অস্থির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সে. অস্থিরতার মধ্যেও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য। ঠাকুরমা আমাকে মায়ের কাছে শুইবার জন্য পাঠাইলেন।

এই সমারোহের মাঝে ঠাকুরদার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলাম। মায়ের বিছানায় প্রতিদিন কলহ বাধিত। পিঠে পিঠে ভাইয়ের মধ্যে প্রীতির চেয়ে বোধ হয় হিংসার সম্পর্ক—তাই ললিত ও আমার মধ্যে কলহ লাগিয়াই থাকিত।

সেদিন সবে পাশ বালিস লইয়া কলহ সুরু হইয়াছে। ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধের মত কোল-বালিস লইয়া ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী—' এমনই মনোভাব।

ছোট পিসী আসিয়া বলিলেন—'অজিত! আয়, বাবা তোকে ডাকছেন।' –

যুদ্ধে বিরতি দিয়া গেলাম। ঠাকুরদাদা বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশিয়া গিয়াছেন—অতি কষ্টে আমার মাথায় হাত দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন 'মানুষ হস্'

বিষণ্ণ পরিজনের মাঝে কি সেই দীপ্ত হাসিভরা আশীর্ব্বাদ—জীবনে যখনই গ্লানি জাগে, তখনই এই অমোঘ বাণী অন্তর আশায় পুর্ণ করে।

ছোট পিসী আমায় ফিরাইয়া নিয়া আসিলেন। আমি কথা কহিলাম না। কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিলাম---আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া আমার কচি মনেও যেন ভাসিয়া উঠিল। ফিরিয়া ললিতের সঙ্গে বিরত যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম না---সে যত যায়গা চাহিল, ছাড়িয়া দিয়া বিষণ্ণ মনে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না—মা আমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে জাগাইয়া তুলিলেন—বলিলেন 'তোর ঠাকুরদাকে দেখ্‌বি ত চল ?'

ঘুমভরা চোখে বলিলাম—'কেন?'

'ঠাকুর স্বর্গে গেছেন।'

সমস্ত বুঝিলাম। উদ্গত অশ্রু কেন যে থামিয়া গেল, বুঝিলাম না। মায়ের হতে ধরিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম, ঠাকুরদাকে উঠানে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। লোকজন হরিধ্বনি দিতেছে।

রোয়াকের উপর বসিয়া মাটীতে পা নামাইয়া দিয়া, সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারে মৃত্যুর সহিত প্রথম পরিচয় হইল। বাড়ীর লোকেরা করুণ কান্না কাঁদিতেছে। আমার মনে হইল, আমিও তাহাদের সঙ্গে কাঁদি, কিন্তু কেন যেন কাঁদিতে পারিলাম না।

বিস্ময়ে, ভয়ে ও শঙ্কায় আমি স্থাণুর মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

লোক জনের ভিড় বাড়িল। লোকেরা আসিয়া চালি বাঁধিল, কাঠ ফাড়িল, তুলসী আনিয়া শিয়রে দিল। তারপর পুষ্পসজ্জিত খাটে শায়িত করাইয়া ঠাকুরমাকে শ্মশানে নিয়া গেল।

'বল হরি, হরি বোল।' কি হৃদয়বিদারকধ্বনি। শববাহীদের সে চীৎকার নিশীথ রাত্রির নিঃস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া কাণে আসিয়া লাগে।

আমি আড়ষ্টের মত বসিয়া বসিয়া সব দেখিলাম, মা আসিয়া বলিলেন 'চল শুতে চল।' বিছানায় গিয়া শুইলাম, কিন্তু ঘুম আর আসে না। শ্মশানের সে চীৎকার দূর হতেও কাণে আসে। বাড়ীর চারিদিকে পরিজনদের আর্ত্তরব আমার চোখের চারিপাশে বিভীষিকা তৈরি করিয়া তুলিল।

মৃত্যুর রহস্য জানি না, কিন্তু জীবনের পথে হয়ত তার প্রয়োজন আছে। আদ্য যুগের বৃদ্ধেরা যদি সমস্ত বাঁচিয়া রহিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে তরুণের জয়যাত্রা বন্ধ থাকিত।

ঠাকুরদার মৃত্যু আমাদের সংসারের চারিদিকে নূতন পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল।

আমাদের সহর ছাড়িয়া বাবা নূতন স্থানে ওকালতি করিতে চলিলেন। ঠাকুরমা বাড়ী আগলাইয়া রহিলেন। স্কুলে পড়ি, কিন্তু ঠাকুরমার কোলের সেই মধুর আশ্রয় আর নাই।

পরবৎসর পূজার পর বাবা বলিলেন--'আমাদের সহরে নিয়ে যাবেন।

ঠাকুরমা ব্যথা-ভরা অন্তরে সম্মতি দিলেন। গৃহের এই পরিচিত ভূমি --এই পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করিয়া নূতন নীড় বাঁধিতে হইবে, তজ্জন্য শখ ছিল না কিন্তু ঠাকুরমাকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, এই বেদনা আমাকে পাইয়া বসিল।

ঠাকুরমাকে বলিলাম -'ঠাকুরমা আমি বাড়ী থাকি।'

ঠাকুরমা আদর করিয়া বলিলেন---'বাড়ী থেকে পড়া ভাল হবে না' কথার মাঝে ব্যথা ও আদর, আমি চুপ করিয়া থাকি।

জীবনের এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভের মাঝেই পুরাতনের সমাপ্তি হইল। বয়স শৈশবের কোঠা হইতে কিশোরে আসিয়া দেখা দিল। কাজেই কৈশোর লীলা বলিবার যদি কখনও সুযোগ হয় তখন বলিব. আজ আমার শিশু জীবনের স্মৃতি তর্পণ এইখানেই শেষ করি।

নূতনের দিকে অগ্রগতি জীবন, কিন্তু তবু অতীতের প্রতি মানুষের কেন এ নাড়ীর যোগ? অতীতকে তুচ্ছ করিতে গেলে মর্মান্তিক ব্যথা লাগে, তাই আজ শৈশবের লীলাচঞ্চল জীবনের রোমাঞ্চকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া দাঁড়ি টানিলাম।

তুচ্ছতার মাঝেও যে অমরত্বের স্বর্ণরেণু লুকানো থাকে, রসিকজন তাহা স্বীকার করিবেন। এই তুচ্ছ ইতিহাসের প্রতি তাই মহাকালের প্রসাদ ভিক্ষা করি।

সমাপ্ত